।। প্রবন্ধ ।।

সংজ্ঞা, উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য

'প্রবন্ধ' বা 'Essay' এক বিশেষ ধরনের গদ্যরচনা, Saintsbury-র শব্দবন্ধে 'Work of prose art', যার একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। ষোড়শ শতকে ফরাসি লেখক Michel de Montaigne তাঁর *Essais* (1580) গ্রন্থের শিরোনামে শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন 'essai' বা 'attempt', অর্থাৎ 'প্রয়াস' এই মূলগত অর্থে। Montaigne-এর নির্দেশিত অর্থে ও রূপরীতিতে 'প্রবন্ধ'কে প্রথম ইংরেজি ভাষায় প্রচলন করেন ফ্রান্সিস বেকন তাঁর তিনটি সংস্করণে প্রকাশিত 'Essays' (1597, 1612, 1625)-এ। Montaigne ও বেকনেরও বহু পূর্বে প্রাচীনকালে গ্রিস ও রোমে প্রবন্ধধর্মী গদ্যরচনার চর্চা করেছিলেন থিওফ্র্যাসটাস, প্লুতার্ক, সিসেরো এবং সেনেকা। প্রাচীন প্রয়োগে 'প্রবন্ধ' শব্দটির অর্থ ছিলো 'উপায়' বা 'ব্যবস্থা'। সংস্কৃত ভাষায় 'প্রবন্ধ' বলতে বোঝাতো 'প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন' এবং সাহিত্যের সকল শাখাতেই প্রবন্ধের চলন ছিলো।

'প্রবন্ধ' কী বা কেমন রচনা? মোটের ওপর যে-কোন বিষয় নিয়ে লেখা নাতিদীর্ঘ সাহিত্যিক গদ্যরচনাকেই প্রবন্ধ বলা হয়ে থাকে, যদিও এ-বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। ড. স্যামুয়েল জনসন তাঁর 'অভিধান' (১৭৫৫)-এ 'প্রবন্ধ' বলতে এক জাতীয় শিথিল ও অনিয়মিত রচনার কথা বলেছিলেন—'a loose sally of the mind, an irregular, indigested piece, not a regular and orderly performance.' অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধানে প্রদত্ত সংজ্ঞায় প্রবন্ধের নাতিদীর্ঘ রূপ, বিষয়ের অনির্দিষ্টতা ও জনসন-নির্দেশিত শৃঙ্খলা ও গঠন-শৈথিল্যের কথা আছে—"A composition of moderate length on any particular subject or branch of a subject, originally implying want of finish, 'an irregular, indigested piece', but now said of a composition more or less elaborate in style, though limited in range." ড. জনসনের সংজ্ঞাকে মূলত না-বাচক বলে মনে করেছেন Hugh Walker ; তাঁর মতে, প্রবন্ধের স্বভাবই হলো কিছুটা অনিশ্চিত অসম্পূর্ণতা—"Something tentative, so that there is a justification for the conception of incompleteness and want of system." হাডসন তাঁর মন্তব্যে প্রবন্ধের স্বল্প পরিসর গঠন ও সমগ্রতার অভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন—"The essay, then, may be regarded roughly as composition on any topic, the chief negative features of which are comparative brevity and the comparative want of exhaustiveness."

প্রবন্ধকে সংজ্ঞায়িত করার এই কঠিন ও তর্কসাপেক্ষ প্রচেষ্টা থেকে সরে গিয়ে আমরা বরং তার রূপ-রীতির বৈশিষ্ট্যগুলিকে বোঝবার উপায় খুঁজি। যে-কোন বিষয় নিয়েই প্রবন্ধ রচিত হতে পারে যদি সেই বিষয়টি লেখকের ভাবনা-অভিজ্ঞতা-মন-মননের প্রত্যয় দ্বারা যথাযথভাবে চিহ্নিত এবং তাঁর রসবোধে জারিত হয়। গুরুগম্ভীর কিংবা হালকা পরিহাসমণ্ডিত, গভীর ভাবোদ্দীপক কিংবা নিছক বস্তুগত কোনো বিষয়, কোনো সর্বজনীন প্রসঙ্গ বা সমস্যা কিংবা ব্যক্তিগত অভিনিবেশ, যে-কোনো কিছুই প্রবন্ধের বিষয় হয়ে উঠতে পারে লেখকের ব্যক্তিত্বের পরশপাথরের ছোঁয়ায়। অর্থাৎ মূল বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন

Scanned with CamScanner

প্রবন্ধকারের সচেতন দৃষ্টি-ভঙ্গী ও ভাষাশৈলী তাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়ে থাকে। সাধারণভাবে প্রবন্ধ ক্ষুদ্রায়তন গদ্যরচনা, তবে সবক্ষেত্রেই আয়তনের স্বল্পতা প্রবন্ধের শর্ত হিসেবে গণ্য হতে পারে। হিউমের *A Treatise of Human Nature*-কে যদি প্রবন্ধ না বলি, তাহলে লকের *An Essay Concerning Human Understanding*-কে কী বলব? প্লেটোর *Dialogues*, সিসেরোর *De Senectute* ড্রাইডেনের সমালোচনামূলক *Essay on Dramatic Poesy*, পোপের নীতিমূলক কাব্য *An Essay on Criticism* ও পত্রকাব্য *Essay on Man*, বঙ্কিমচন্দ্রের *কৃষ্ণচরিত্র*, *কমলাকান্তের দপ্তর*, রবীন্দ্রনাথের *শান্তিনিকেতন* গ্রন্থভুক্ত ধর্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতাবলী—এ সবই যদি 'প্রবন্ধ' বলে মনে করা হয় তাহলে তো তার আয়তন, বিষয় ও রূপবন্ধের বিভিন্নতা স্বীকার করতেই হয়। স্মৃতিচারণামূলক রচনা, যথা রবীন্দ্রনাথের *জীবনস্মৃতি*, *পত্রাবলী*, *ছিন্নপত্র*, ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা, যথা বিদ্যাসাগারের *ব্রজবিলাস*, সবই তো নানা রূপে লেখা নানা স্বাদের প্রবন্ধ। সাধারণভাবে বাংলা ও ইংরেজি সহ সকল ভাষাতেই গদ্যের উদ্ভব ও ব্যবহারের সময় থেকেই প্রবন্ধের আত্মপ্রকাশ। ইংরেজি ভাষায় নবম শতক ও তার পরবর্তীকালে অনুবাদকার ও ধর্মযাজকদের হাতে এবং বাংলায় শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাদ্রি তথা পণ্ডিতদের হাতে প্রবন্ধের জন্ম। এলিজাবেথের যুগে ফ্রানসিস বেকন ও উনিশ শতকের প্রারম্ভিক পর্বে রামমোহন রায় যথাক্রমে ইংরেজি ও বাংলা প্রবন্ধ শিল্পের সার্থক রূপকার। গদ্যের উন্মেষ ও বিবর্তনের ইতিহাসে প্রবন্ধের অনুশীলন পর্যালোচনা করলে একেবারে শুরু থেকেই এই শিল্পরূপের কয়েকটি লক্ষণ চিহ্নিত করা যেতে পারে :

১. গদ্যই প্রবন্ধশিল্পের স্বাভাবিক মাধ্যম ;
২. যুক্তি-তর্ক-বিচার-বিশ্লেষণ ইত্যাদির আশ্রয়ে প্রবন্ধের প্রাথমিক লক্ষ্য তত্ত্ব ও তথ্যের উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার ;
৩. যৌক্তিক পারম্পর্য তথা বিশ্লেষণী ঋজুতার সঙ্গে কল্পনা ও আবেগের প্রয়োগ ;
৪. বিষয় ও উপস্থাপন রীতির বৈচিত্র্য।

প্রবন্ধের শ্রেণীবিভাগ :

মোটের ওপর প্রবন্ধকে দুটি প্রধান শ্রেণি-তে ভাগ করা যায় : (১) বস্তুনিষ্ঠ, তন্ময়, আনুষ্ঠানিক প্রবন্ধ (Formal Essay) ; (২) ব্যক্তিনিষ্ঠ, মন্ময়, ভাবপ্রধান প্রবন্ধ (Personal/ Familiar Essay)। বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় প্রবন্ধ বুদ্ধিপ্রধান ও তাতে বিষয়বস্তুর প্রাধান্য। লেখক তথা বিষয়ীর ব্যক্তিত্ব সেখানে বস্তুনিষ্ঠা ও আনুষ্ঠানিকতা, জ্ঞান ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণ ঔজ্জ্বল্যে আচ্ছাদিত। প্রবন্ধকার এখানে নিয়মনিষ্ঠ ও সংযত ; তাঁর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান-বুদ্ধিই পাঠকের মনোযোগ দাবি করে, পাঠক ও লেখকের মধ্যে কোনো হৃদয়ের সংযোগ ঘটে না। সমকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রশ্ন ও সমস্যা নিয়ে কিংবা বিজ্ঞানের কোনো বিষয় নিয়ে তথ্যনির্ভর, যুক্তিগ্রাহ্য যে-সব প্রবন্ধ, পর্যালোচনা ইত্যাদি লেখা হয়ে থাকে সেগুলিই বস্তুনিষ্ঠ বা আনুষ্ঠানিক প্রবন্ধের উদাহরণ। 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে রচিত অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন, সমাজনীতি-বিষয়ক রচনাবলী নৈর্ব্যক্তিক, তন্ময় শ্রেণীর প্রবন্ধের উদাহরণ। যথা—'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬),

Scanned with CamScanner

'বিজ্ঞানরহস্য' (১৮৮৫), 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৪), 'বিচিত্রজগৎ' (১৯২০) ইত্যাদি। বিশুদ্ধ যুক্তি ও বুদ্ধির প্রাধান্যে, চিন্তাঋদ্ধ মননশীলতায়, তথ্যনিষ্ঠা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণশক্তিতে এইসব রচনা জ্ঞান-বিজ্ঞান-মনীষার শিল্পগুণান্বিত পরিচয়। বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

১. যুক্তিনিষ্ঠা ও ভাবনার নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা থাকবে ;
২. তত্ত্ব ও তথ্যের লক্ষণীয় প্রাধান্য থাকবে ;
৩. প্রাবন্ধিকের ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভবের পরিবর্তে বস্তুনিষ্ঠা ও মননের গুরুত্ব প্রাধান্য পাবে ;
৪. প্রাবন্ধিক বৈজ্ঞানিক তথা বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেবেন ;
৫. প্রবন্ধের বিষয় সম্পর্কে প্রবন্ধকারের থাকবে নিঃস্পৃহতা, নিরপেক্ষতা ও আনুষ্ঠানিক মেজাজ ;
৬. ভাষা ব্যবহারে সতর্কতা ও সংযম। ঋজু ও গম্ভীর ভাষার মাধ্যমে প্রবন্ধের বক্তব্য প্রকাশিত হবে।
৭. পাঠকের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে প্রবন্ধকার শিক্ষক বা পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করবেন।

ভাবপ্রধান, মন্ময় প্রবন্ধ ব্যক্তিচিন্তা-নির্ভর—যুক্তি ও বিশ্লেষণের প্রাখর্য এবং মননের তীব্রতা অপেক্ষা তাতে হৃদয়াবেগেরই প্রাধান্য। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ যখন জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তাচেতনার বিস্ময়কর গভীরতায় আমাদের মগজের চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করে, মন্ময় তথা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ তখন তার ভাবকল্পনার দীপ্তিতে আমাদের হৃদয়ের পিপাসা মেটায়। এই শ্রেণীর রচনায় প্রবন্ধকার নিবিড়, বন্ধুত্বপূর্ণ আন্তরিকতায় পাঠকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান ; বিশদ, জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ অথবা গুরুগম্ভীর প্রশ্ন ও জীবনসমস্যার সূক্ষ্ম মীমাংসায় ব্রতী না হয়ে এই ধরনের প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বিষয়বস্তুকে আত্মগত ভাবরসে স্নিগ্ধভাবে জারিত করে পাঠকের চারপাশে এক শান্ত, আবেগমণ্ডিত বাতাবরণ সৃষ্টি করেন। প্রতিদিনের ছোটোখাটো সুখ-দুঃখ, আবেগ-অনুভব এক রসায়িত, আত্মগত ভঙ্গীতে পাঠকের কাছে অতীব বিশ্বাসযোগ্যভাবে পরিবেশন করেন তিনি। বস্তুনিষ্ঠ প্রাবন্ধিক যখন সোচ্চার, হয়তো বা কখনো প্রচারমুখী, ব্যক্তিগত প্রাবন্ধিক তখন নিরুচ্চার, আত্মমগ্ন, গীতিকবির মতো নিবেদনের বিনম্র ভঙ্গিতে পাঠকের হৃদয়ানুরাগের শরিক। Alexander Smith-এর ভাষায়—"The essay, as a literary form, resembles the lyric, in so far as it is moulded by some central mood—whimsical, serious or satirical." ব্যক্তিগত প্রবন্ধ এক আন্তরিক, আত্মমগ্ন স্বগতকথনের মতো, যার কোনো নির্দিষ্ট বিষয় বা রীতি স্থিরীকৃত থাকে না। সমালোচক-প্রাবন্ধিক Robert Lynd তাই বলেছেন—"Sometimes it is nearly a sermon, sometimes it is nearly a short story. It may be a fragment of autobiography, or a piece of nonsense. It may be satirical or vituperative or sentimental. It may deal with any subject from the Day of Judgement to a pair of scissors." অতি সাধারণ পরিচিত বিষয়কে এই শ্রেণির প্রাবন্ধিক আত্মনিষ্ঠ কল্পনায় অ-সাধারণ করে তোলেন ; তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত অথচ আপাত-অসংলগ্ন রসকল্পনা, যাকে ড. জনসন বলেছিলেন 'loose sally of the mind', আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। তাঁর *The Art of the Essayist* শীর্ষক প্রবন্ধে

Scanned with CamScanner

A. C. Benson ব্যক্তিগত মন্ময় প্রবন্ধের সারাৎসারটি এইভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন : 'it is personal sensation, personal impression, evoked by something strange or beautiful or curious or interesting or amusing.' ভাবপ্রধান বা মন্ময় প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

১. যুক্তি ও মননশীলতার পরিবর্তে লেখকের হৃদয়াবেগেরই প্রাধান্য থাকবে ;
২. বিষয়বস্তু লেখকের কল্পনা তথা ভাবরসে জারিত হয়ে পাঠকহৃদয়কে স্পর্শ করবে ;
৩. সরস, মর্মস্পর্শী, আত্মগত ভঙ্গিতে পাঠককে কাছে টেনে নেন প্রাবন্ধিক ;
৪. বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধকারের মতো মন্ময় প্রাবন্ধিক সোচ্চার বা উদ্দেশ্যতাড়িত নন, বরং আত্মমগ্ন ও কিছুটা রহস্যময় ;
৫. ভাবপ্রধান প্রবন্ধ মূলত ব্যক্তিগত, নৈর্ব্যক্তিক নয় ;
৬. আবেগ ও কল্পনার প্রোজ্জ্বলতায় এ প্রবন্ধ লেখকের ব্যক্তিত্বের দর্পণ ;
৭. ভাষার ব্যবহারে প্রবন্ধকার অনেক বেশি স্বাধীনতা পান এবং পাঠকের সঙ্গে আন্তরিক বিনিময় গড়ে তোলেন।

সমাজ, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের ভাণ্ডারটি বাংলায় যথেষ্ট সমৃদ্ধ হলেও ব্যক্তিগত তথা মন্ময় প্রবন্ধ, যা মনের পরিধিকে প্রশস্ত করে ভাবকল্পনার মাধুর্যে তেমন রচনা বিশেষ সুলভ নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-নিবন্ধে তাঁর কবিচেতনা, দার্শনিক উদারতা ও এক প্রসন্ন উজ্জ্বল পরিহাস লক্ষ করা যায় সন্দেহ নেই, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হৃদয়ের স্পর্শ অপেক্ষা বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ও ভাবসম্পদই সেখানে বড় হয়ে ওঠে যেন। রবীন্দ্রনাথের *পঞ্চভূত* ও *বিচিত্র প্রবন্ধ* ব্যক্তিগত প্রবন্ধের নিদর্শন রূপে গণ্য হয়ে থাকে। তাঁর *জীবনস্মৃতি* ও *ছিন্নপত্র*-ও এই মন্ময় ভাবকল্পনার দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল। অন্যান্যদের মধ্যে এই শ্রেণীর প্রবন্ধকার হিসেবে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম করা যায়।

লেখকের ব্যক্তিত্বের সৌরভ, গীতিকবির অনুরূপ এক কল্পনাপ্রবণ আত্মস্বাতন্ত্র্য যদি ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সারকথা হয় তবে তেমন রচনার অজস্র উদাহরণ ইংরেজি সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। ইউরোপের সাহিত্যে যিনি 'প্রবন্ধ' নামক শিল্পরূপটির প্রবর্তন করেছিলেন সেই ফরাসি প্রাবন্ধিক Montaigne এই আত্মসচেতন ব্যক্তিগত প্রবন্ধের রূপকার। তিনি নিজেই যেন তাঁর প্রবন্ধের বিষয় ; নিজের কথা, নিজের প্রিয়জন ও পরিচিতদের কথা, নিজের ভাবনাচিন্তা ইত্যাদি স্বগতকথনের মতো করে বলেছিলেন এক আপাত-শিথিল, আন্তরিক ভাষা ও ভঙ্গিতে। প্রথম ইংরেজ প্রবন্ধকার বেকন Montaigne-এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও তাঁকে ঠিক ব্যক্তিগত প্রবন্ধের লেখক বলা চলে না। নবজাগরণের জ্ঞানচর্চার ভাবমণ্ডলে বেকন ছিলেন এক প্রাজ্ঞ দার্শনিক জ্যোতিষ্ক। তাঁর প্রবন্ধাবলী মূলত জ্ঞানগর্ভ ও উদ্দেশ্যমূলক, তাঁর নিজের কথাতেই সেগুলি ছিল 'Counsels, Civil and Moral' অথবা 'dispersed meditations'। অষ্টাদশ শতক ছিলো ইংলণ্ডে 'গদ্য ও যুক্তির যুগ'। এই যুগে সাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রসারের দৌলতে সামাজিক ও নীতিমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধের ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল। 'The Tatler', 'The Spectator' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন রিচার্ড স্টিল ও জোসেফ অ্যাডিসন। এঁদের রচনায় লেখকের ব্যক্তিত্বের ছাপ যে ছিল না তা নয়, তবে সামাজিক উদ্দেশ্যধর্মিতা ও বস্তুনিষ্ঠার প্রভাবে ব্যক্তিগত চিহ্নগুলি ছিলো দুর্লক্ষ্য। ইংরেজিতে প্রথম ব্যক্তিগত তথা মন্ময় প্রবন্ধ লেখেন চার্লস ল্যাম্ব। তাঁর *Essays of Eila*-র প্রবন্ধগুলি জীবনের ছোটো-বড় সুখ-দুঃখ, আনন্দ-

Scanned with CamScanner

বেদনাকে এক অনবদ্য হাসি-কান্নার মিশ্রণে পাঠকদের হৃদয়ের সান্নিধ্যে উপস্থিত করেছিলো। 'Elia' ছিলো লেখকেরই প্রতিরূপ ; তাকে নিয়ে লেখা রচনাগুলি আত্মজৈবনিক ; আবেগ ও কল্পনা, স্মৃতিমেদুরতা ও অন্তর্মুখিতা এবং কাব্য সৌন্দর্যে সেগুলি রোমান্টিক মন্ময়তার আশ্চর্য উদাহরণ। ল্যাম্ব ছাড়া রোমান্টিক যুগের আর এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগত প্রাবন্ধিক হলেন হ্যাজলিট, যাঁর 'On a Sundial', 'On living to one's self' ইত্যাদি রচনা পাঠকস্মৃতিতে জাগ্রত। ব্যক্তিচেতনার শক্তি ও সৌরভ কতখানি আকর্ষণীয় হতে পারে হ্যাজলিটের 'On living to one's self' প্রবন্ধের এই লাইনগুলিতে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে : "What I mean by living to one's self is living in the world, as in it, not of it ; it is, as if no one knew there was such a person, and you wished no one to know it ; it is to be a silent spectator of the mighty scene of things, not an object of attention or curiosity in it ; to take a thoughtful anxious interest in what is passing in the world, but not to feel the slightest inclination to make or meddle with it." ল্যাম্ব ও হ্যাজলিটের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ধারাটিকে পুষ্ট করেছিলেন লেই হান্ট ও ডি' কুইন্সি।

ল্যাম্ব ও অন্যান্য রোমান্টিক গদ্য লেখকদের হাতে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের যে স্বর্ণযুগ সূচিত হয়েছিল তারই সার্থক উত্তরসূরি E. V. Lucas, A. G. Gardiner, Robert Lynd, J. B. Priestley ও আরও অনেকে। Macaulay, Carlyle, Armold প্রমুখের ঐতিহাসিক, দার্শনিক, সমালোচনামূলক গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের জ্ঞানগর্ভ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণের পরিমণ্ডলে লঘুকান্তি হাস্যোচ্ছলতা ফিরিয়ে এনেছিলেন ল্যাম্বের অনুসারী লুকাস, যাঁর 'Pleasure Trove', 'Loiterer's Hervest', 'Diversions', 'Giving and Receiving' তাঁকে ইংরেজি সাহিত্যে স্থায়ী আসন দিয়েছে। গার্ডিনারের প্রসিদ্ধি 'Alpha of the Plough' নামে বিশেষ জনপ্রিয় তাৎক্ষণিক ও আপাত-তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সরস ভঙ্গিতে লেখা প্রবন্ধাবলীর জন্য। তাঁর তিনটি মনোরঞ্জক সংকলন—*Many Furrows, Leaves in the Wind, Pebbles on the Shore*, কিভাবে লেখকের ভঙ্গি, মেজাজ ও স্বতস্ফূর্ত চাপল্য ও সরসতা যে-কোন বিষয় থেকেই অসামান্য প্রবন্ধ তৈরি করতে পারে তার-ই প্রমাণ দেয়। সহজ ও সরল ব্যক্তিত্বমণ্ডিত গদ্যে আর একজন প্রাবন্ধিক পাঠককে মুগ্ধ করেছেন ; তিনি লিণ্ড, যাঁর *Swallows*, *Sea-side*, কিংবা *The Darkness* ইংরেজি গদ্যসাহিত্যের এক একটি মূল্যবান রত্ন। প্রিস্টলি ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড বারবার ঘুরে যা দেখেছিলেন তাঁর সেইসব অভিজ্ঞতা ও অনুভব, পাহাড়-নদী-জলাভূমি-গির্জা-সরাইখানা-পুরোনো শহর ইত্যাদি, হালকা রসে ও শৈলীর নিজস্বতায় ব্যক্ত ও বিধৃত হয়েছে তাঁর প্রবন্ধে।

বিশেষ উপলক্ষে বা প্রয়োজনে লেখা, কোনো সিরিয়াস অথবা অ্যাকাডেমিক বিষয় নিয়ে লেখা, কিংবা পাঠকদের চিন্তা ও জ্ঞানের সীমানা বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে রচিত কোনো প্রবন্ধ সঠিক অর্থে সৃজনী গদ্যের উদাহরণ হতে পারে কিনা সে বিতর্কে প্রবেশ না করেও এটুকু বলা যায় যে ব্যক্তিগত/মন্ময় প্রবন্ধ অনেক বেশি মৌলিক ও সৃজনশীলতার কুললক্ষণযুক্ত। প্রসঙ্গত স্মরণীয় ই. ভি. লুকাসের উক্তি : 'A good essay, more than a novel, a poem, a play or a treatise, is personality translated into print.'

Scanned with CamScanner

বস্তুনিষ্ঠ/তন্ময় প্রবন্ধের শ্রেণীভেদ :
বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের মূল অবলম্বন। তাই বিষয়, প্রসঙ্গ ও রচনার উদ্দেশ্য
বিষয়বস্তুর গুরুত্ব
অনুযায়ী এই জাতীয় প্রবন্ধের কয়েকটি উপবিভাগ চিহ্নিত করা যেতে পারে :

(১) আলোচনা/গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ : কোনো একটি বিষয়ে নির্দিষ্ট ও সুশৃঙ্খল আলোচনা, বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যাই বিচার অপেক্ষা তার বস্তুস্বরূপের অনুসন্ধানই এ ধরনের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ইংরেজ দার্শনিক জন লকের *Essay Concerning Human Understanding*, রোমান্টিক কবি শেলীর *The Defence of Poetry*, বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ সংগ্রহভুক্ত 'দ্রৌপদী' 'লোকশিক্ষা' ইত্যাদি এই শ্রেণীর তন্ময় প্রবন্ধের উদাহরণ।

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক জন লকের দীর্ঘ দার্শনিক প্রবন্ধ 'Essay Concerning Human Understanding' (1690) আলোচ্য শ্রেণীর উদাহরণস্বরূপ একটি 'Treatise', দেকার্তের 'সহজাত ধারণা'র তত্ত্বকে নাকচ করে লক তাঁর অভিজ্ঞতাবাদী অভিজ্ঞতাতত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন এই প্রবন্ধে। অভিজ্ঞতা-ই লকের মতে সকল ধারণার একমাত্র উৎস। মানুষের জ্ঞানের উদ্ভব ও সীমা এবং তার প্রকৃতি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন লক। সহজবোধ্য ও অলঙ্কারবিহীন গদ্যে লক তাঁর এই বিষয়নিষ্ঠ অনুসন্ধানে মানবমনের ক্রিয়া ও ভাবানুষঙ্গ বিষয়ে নতুন আলোকপাত করেছিলেন।

রোমান্টিক কবি-সম্প্রদায়ের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব পি. বি. শেলির 'Defence of Poetry' (1821) কবিতার স্বরূপ ও মূল্যায়ন বিষয়ে এক দীর্ঘ তাত্ত্বিক প্রস্তাবনা। বন্ধু টমাস লাভ পিকক তাঁর *The Four Ages of Poetry* শীর্ষক পুস্তিকায় যুক্তি ও বিজ্ঞানের যুগে কবিতার উপযোগিতাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করালে প্রত্যুত্তরে শেলি কবি ও কবিতার পক্ষ সমর্থন করে সিডনির 'Defence of Poesie'-র ভঙ্গিতে রচনা করেছিলেন আবেগদীপ্ত অথচ যুক্তি-শৃঙ্খলা নির্ভর এই গবেষণা সন্দর্ভ। শিল্প বিষয়ে উপযোগিতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতায় শেলি কবি-কল্পনার স্বকীয়তার ওপর আলোকপাত করেছিলেন, কবিতার সামাজিক মূল্য ও কর্তব্য এবং কবির ভবিষ্যদ্বাণী ভূমিকার কথা বলেছিলেন। আগামীদিনের বিধিনিষেধমুক্ত এক সমাজের বিধায়করূপে কবিকে চিহ্নিত করেছিলেন। মহৎ মানবিক গুণাবলীর যথাযথ বিকাশে যে নিছক বিশ্লেষণী যুক্তি যথেষ্ট নয়, তার জন্য সৃজনী কল্পনারও যে প্রয়োজন, এই প্রত্যয় ধ্বনিত হয়েছিলো আবেগমণ্ডিত, বস্তুনিষ্ঠ গদ্যে :

> "We have m... oral, political, and historical wisdom than we know how to reduce into practice : we have more scientific and economical knowledge than can be accommodated to the just distribution of the produce which it multiplies... There is no want of knowledge respecting what is wisest and best in morals, government and political economy... But we want the creative faculty to imagine, that which we know ; we want the generous impulse to act on that which we imagine ; we want the poetry of life."

লক ও শেলির দীর্ঘ, গবেষণাভূমিষ্ঠ আলোচনার পাশাপাশি আমাদের নজরে পড়বে বঙ্কিমের বিবিধ প্রবন্ধভুক্ত 'দ্রৌপদী', ও 'লোকশিক্ষা'র মতো স্বল্পদৈর্ঘ্যের অমূল্য প্রবন্ধ। মহাভারত-এর ব্যতিক্রমী নারী-চরিত্র দ্রৌপদীকে নিয়ে দশ বছরের ব্যবধানে দুটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন বঙ্কিম। 'আর্য সাহিত্যের আদর্শ কুলাভিষিক্তা' নায়িকা সীতার বিপরীত চরিত্ররূপে মহাভারতকারের অপূর্ব সৃষ্টি দ্রৌপদীর তেজস্বিতা ও ধর্মাচরণের দুরূহ সমন্বয় বঙ্কিম তাঁর অনবদ্য রসাশ্রিত বিশ্লেষণী গদ্যে উপস্থাপিত করেছিলেন 'দ্রৌপদী' শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধে। কেন দ্রৌপদী

এক অনুকরণীয় নারী চরিত্র, প্রকৃত ও সত্য, তাঁর ব্যাখ্যার সারবত্তা উদ্ঘাটন দৃষ্টি ক্ষমতারই। এর দশ বছর পরে লেখা 'দ্রৌপদী' প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্রস্তাবে বঙ্কিম উপস্থিত করেছিলেন 'দ্রৌপদী চরিত্রের প্রধানাংশ যে ধর্ম' তার এক গভীর ও ব্যতিক্রমী ব্যাখ্যা। এই প্রবন্ধ বুদ্ধিমান দ্রৌপদীকে দেখেছিলেন এক তত্ত্বানুবিক্ষণে — নির্লিপ্ত, আত্মনিয়ন্ত্রিত, সমাজসচেতন নারীর উদাহরণ হিসেবে। দুটি প্রবন্ধেই বঙ্কিমের অনন্য গদ্যশৈলী ও বিশ্লেষণী শক্তির অসামান্য নিদর্শন পাওয়া যায় :

১. দ্রৌপদী স্ত্রীজাতি বলিয়া তাঁহার প্রকৃত ধর্ম নাশ, কিন্তু তাঁহার পতিভক্তির অসামান্য— যখন তিনি মহিষী রাজমহিষী হইতে না পারেন, যখন অন্যমনস্কে সাধ্বী পতিপরায়ণতা আছে লোপ হয় না। এই গুণে পতিপরায়ণতা, তাঁহাতে অপূর্ব অনন্যপর সুফল। এই অসামান্য ধর্মানুরাগ, এবং তেজস্বিতার সহিত সেই ধর্মানুরাগের সম্মিলিত প্রভাব, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাঁহার স্বামিগণ দাসত্ব হইতে মুক্তরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। [দ্রৌপদী]
২. দ্রৌপদী স্ত্রীজাতির অনাসক্ত ধর্মের মূর্তিমতী। ঈশ্বরকে তাঁহাকে প্রাপ্ত করাই জীবনের উদ্দেশ্য। তাই পতিদের ন্যায় পঞ্চ পুরুষের সংসর্গযুক্তা হইয়াও দ্রৌপদী সাধ্বী, পতিব্রতার পরাকাষ্ঠা। পঞ্চপতি দ্রৌপদীর নিকট এক পতি মাত্র, উপাসনার এক বস্তু এবং ধর্মাচরণের একমাত্র অভিন্ন উপলক্ষ। যেমন প্রকৃত ধর্মাত্মার নিকট বহু দেবতাও এক ঈশ্বর মাত্র— ঈশ্বরই জ্ঞানীর নিকট একমাত্র অভিন্ন উপাস্য, তেমনি পঞ্চস্বামী অনাসক্তা দ্রৌপদীর নিকট এক মাত্র ধর্মাচরণের স্থল। [দ্রৌপদী/দ্বিতীয় প্রস্তাব]

(২) বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ : বিষয়গৌরবী তথা বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের এই শাখার অবলম্বন বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব ও তথ্যের সমাহার ও বিশ্লেষণ। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধের সূত্রপাত করেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। যুক্তিনির্ভর, বিজ্ঞানমনস্কতা, ভাষার ওজস্বিতা ও প্রাঞ্জলতা অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধাবলীর বৈশিষ্ট্য। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের রচয়িতাদের মধ্যে আর একটি স্মরণীয় নাম রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব পরিচয় ও জগদীশচন্দ্র বসুর 'অব্যক্ত' এই শ্রেণীর উল্লেখনীয় উদাহরণ। সাম্প্রতিককালের বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ সাহিত্যে সমরজিৎ করের লেখাগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

(৩) ঐতিহাসিক প্রবন্ধ : প্রাচীন অথবা সমকালীন ইতিহাসের প্রেক্ষাপট ও ঘটনাবলী অবলম্বনে তথ্যনির্ভর, যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণে রচিত হয় ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের সুদীর্ঘ রচনা 'বঙ্গদেশের কৃষক'। তথ্যবহুল ও মননশীল এ-প্রবন্ধে বঙ্কিম বঙ্গদেশের কৃষকদের দুরবস্থা, জমিদারদের অমানবিক দমন-পীড়ন, রাষ্ট্রীয় আইন, কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভয়াবহ ফলশ্রুতি তুলে ধরেছেন যুক্তিনিষ্ঠা ও হৃদয়বৃত্তির মিশ্রণে। বঙ্কিমের 'বাঙ্গালার ইতিহাস', ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'পুরাবৃত্তসার' ও 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' এই শ্রেণীর প্রবন্ধের স্মরণীয় নিদর্শন। ঐতিহাসিক প্রবন্ধের অপরাপর লেখকদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং একালের অমলেশ ত্রিপাঠী প্রমুখের নাম করা যায়।

(৪) রাজনৈতিক প্রবন্ধ : রাজনৈতিক চিন্তা, তত্ত্ব, ঘটনাবলী ইত্যাদি অবলম্বনে লেখা হয় রাজনৈতিক প্রবন্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' তাঁর রাজনৈতিক চেতনার ফলশ্রুতি। শ্রেণীবৈষম্য ও অর্থবৈষম্যের ভয়ানক পরিণতির চিত্রাঙ্কন ও সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী এই প্রবন্ধগ্রন্থকে স্মরণীয় করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা প্রজা', ও 'কালান্তর' শীর্ষক রচনায় দেশ ও কালের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক চিন্তার ছোঁয়া পাঠককে প্রভাবিত করে। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক প্রবন্ধের রচয়িতারূপে মুজফ্ফর আহমেদ ও নজরুল ইসলামের নাম করা যেতে পারে।

(৫) সামাজিক/সমাজসমস্যামূলক প্রবন্ধ : কোনো সামাজিক বিষয়, প্রসঙ্গ, সমস্যা, প্রশ্ন ইত্যাদিকে আশ্রয় করে যুক্তি-তর্ক, বিচার-বিশ্লেষণের পথ ধরে লিখিত হয় এ-ধরনের বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ। বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব', 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার', ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'সামাজিক প্রবন্ধ' ও রবীন্দ্রনাথের 'সভ্যতার সঙ্কট' সামাজিক সমস্যা ও সঙ্কট নিয়ে লেখা সমাজচিন্তা তথা সমাজসংস্কারমূলক প্রবন্ধের উজ্জ্বল উদাহরণ।

(৬) জীবনীমূলক প্রবন্ধ : কোনো বরণীয় ব্যক্তিত্বের জীবন নিয়ে লেখা অথবা আত্মজৈবনিক প্রবন্ধের সঙ্গে জীবনী বা জীবনচরিতের পার্থক্য নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী' এবং রবীন্দ্রনাথের *জীবনস্মৃতি* জীবনীমূলক প্রবন্ধের গোত্রভুক্ত। জীবনস্মৃতি ঠিক রবীন্দ্র-জীবনকাহিনি নয় ; বাল্য ও কৈশোরকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা জীবন-উপলব্ধির এক মনোজ্ঞ স্মৃতিলেখা। এখান থেকেই জীবনী/জীবন-চরিতের সঙ্গে জীবনীমূলক প্রবন্ধের তফাতটি আন্দাজ করা যাবে।

এইসব শ্রেণীবিভাগের কোনো স্পষ্ট সীমারেখা নির্ণয় করা কঠিন। এগুলি ছাড়াও বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের আরো কিছু শাখা-প্রশাখা চিহ্নিত করা সম্ভব। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে বস্তুনিষ্ঠ, বিশ্লেষণী, সমালোচনাধর্মী প্রবন্ধের ভাণ্ডার ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বিশেষ সমৃদ্ধ। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে যেসব প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয় তন্ময় প্রবন্ধের সেও আর এক স্বতন্ত্র শ্রেণি।

মন্ময়/ভাবপ্রধান/ব্যক্তিনিষ্ঠ/আত্মগৌরবী প্রবন্ধ :

বস্তুনিষ্ঠ তথা বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ যুক্তি-তর্ক, তত্ত্ব-তথ্য-বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠককে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করতে প্রয়াসী। ব্যক্তিগত তথা আত্মগৌরবী প্রবন্ধে পাঠকের সঙ্গে প্রাবন্ধিকের গড়ে ওঠে এক নিকট বন্ধুত্বের সম্পর্ক। তত্ত্ব, তথ্য, জ্ঞান ইত্যাদি এ-জাতীয় রচনায় লেখকের হৃদয়ানুভূতির রসে জারিত হয়ে পাঠকের আবেশ ও কল্পনাকে উদ্রিক্ত করে। যে-কোন বিষয়-ই ব্যক্তিনিষ্ঠ বা মন্ময় প্রবন্ধের বিষয় হয়ে উঠতে পারে যদি প্রবন্ধকারের ব্যক্তিত্ব ও হৃদয়াবেগের সজীব স্পর্শ তাতে থাকে। কোনো মত বা বাণী প্রচারে সোচ্চার না হয়ে ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ পাঠককে কাছে টেনে নেয়।

ফরাসি প্রাবন্ধিক মতায়েন প্রথম এ-জাতীয় রচনার সূত্রপাত করেছিলেন। রোমান্টিক যুগের ইংরেজ প্রবন্ধকার চার্লস ল্যাম্ব তাঁর *Essay of Elia*-র প্রবন্ধগুলিতে আত্মপ্রক্ষেপময়, সরসতা ও বিষণ্ণতার আশ্চর্য মিশ্রণে উজ্জ্বল এক জগত নির্মাণ করেছিলেন। বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের *লোকরহস্য* ও *কমলাকান্তের দপ্তর* আত্মগৌরবী প্রবন্ধের স্মরণীয় উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের *বিচিত্র প্রবন্ধ*-এ ব্যক্তিনিষ্ঠ/মন্ময় প্রবন্ধের অনেক লক্ষণই লক্ষ করা যায়। কিভাবে একজন প্রবন্ধলেখক অন্তরঙ্গ ভাষা ভঙ্গিতে পাঠককে কাছে টেনে নিয়ে অনুভূতিময় ভাবনা ও জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে মেলে ধরতে পারেন তার উদাহরণ পাওয়া যাবে Charles Lamb-এর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'The Superannuated Man'-এর এই উক্তিতে :

> 'If peradventure, Reader, it has been thy lot to waste the golden years of thy life—thy shining youth—in the irksome confinement of an office ; to have thy prison days prolonged through middle age down to decrepitude and silver hairs, without hope of release or respite ; to have lived to forget that there are such things as holidays, or to remember them but as the prerogatives of childhood ; then, and then only, will you be able to appreciate my deliverance.'

Scanned with CamScanner

॥ রম্যরচনা ॥

এবার আমরা 'রম্যরচনা' বা 'belles letters' প্রসঙ্গে আলোচনায় যাবো। 'রম্যরচনা' নামটা হাল আমলের হলেও 'বেল লেটর' কিন্তু অনেক দিনের। ফরাসি এই অভিধায় এক ধরনের 'লঘু-রচনা' ('fine-writing')-কে বোঝাতো যা সুচারু, পরিমার্জিত, সুললিত গদ্য, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রচনার থেকে স্বাদে-স্বভাবে আলাদা। অষ্টাদশ শতকের গোড়ার জোনাথন সুইফ্‌ট্‌ কথাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন The Talter সাময়িক পত্রের একটি সংখ্যায়। উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ায় এই ধরনের হাল্কা প্রবন্ধধর্মী রচনা ইংরেজি সাহিত্যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিলো। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় Max Beerholm-এর প্রবন্ধাবলী ও Andrew Lang-এর *Letters to Dead Authors*-এর।

'রম্যরচনা' অভিধাটি যথোপযুক্ত কিনা তা নিয়ে অবশ্য মতপার্থক্য হতে পারে। যে-কোনো রচনাকে সাহিত্য পদবাচ্য হতে হলে তো রম্য হতেই হয়। তবে কি সাধারণ অর্থে যাকে প্রবন্ধ বলা হয় তার থেকে স্বাতন্ত্র্য বোঝাতেই 'রম্যরচনা' নামকরণ? একথা ঠিক যে 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধে'র সঙ্গে এই ধরনের লঘু রচনার প্রভেদ নির্দেশ করা সর্বদা সহজসাধ্য নয়। কোনো 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ' বা হালকা 'familiar essay' 'রম্যরচনা'র গোত্রভুক্ত হতেই পারে, যদিও 'রম্যরচনা' ব্যক্তিগত হবেই এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

জন্মলগ্ন থেকেই বাংলা গদ্যের দুটি সমান্তরাল ধারা লক্ষ করা যায়। একটি ভারী বা পণ্ডিতি সুরবিশিষ্ট, অন্যটি সহজ বা ঘরোয়া। ঐ ভারী জাতের বিচার বিশ্লেষণমূলক গদ্যরচনাকে বলা হয়েছে প্রবন্ধ, আর হালকা সুরের রচনার ধারাটি ইদানীং 'রম্যরচনা' অভিধা পেয়েছে। বিদ্যাসাগরের প্রভাবতী সম্ভাষণ-এ ও আত্মচরিত-এ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর কোথাও কোথাও, সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌ ভ্রমণকাহিনির ও রাজনারায়ণ বসুর সেকাল আর একাল-এর জায়গায় জায়গায়, চন্দ্রনাথ বসুর একটি পাখী, কালীপ্রসন্ন ঘোষের ঐহিক অমরতা জাতীয় লেখায় পাওয়া যায় আদি রম্যরচনার হালকা ছাঁদটি। বঙ্কিমচন্দ্রের লোক রহস্য ও কমলাকান্তের দপ্তর-এও কি লঘু চাল ও রমণীয়তার ছাপ নেই? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে সেই রমণীয়তা পূর্ণতর রূপ পেয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রবন্ধ-এর রচনাগুলি, প্রমথ চৌধুরীর বীরবলী রচনার একটা বড় অংশ বাংলা 'রম্যরচনা'র অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত। সেই থেকে শুরু করে একাল পর্যন্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, দিলীপকুমার রায়, সৈয়দ মুজতবা আলি, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, জ্যোতির্ময় রায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, হিমানীশ গোস্বামী, তারাপদ রায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও আরো অনেকে এই বিশেষ শ্রেণীর রচনার ভাণ্ডার ভরিয়ে দিয়েছেন।

'রম্যরচনা' পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার-বিশ্লেষণ থেকে দূরবর্তী এক লঘুচালের সৃষ্টিমূলক গদ্যরচনা। এতে কোথাও দেখি খানিক গল্পের আভাস, আবার কোথাও একটু কাব্যের মাধুর্য, অন্য কোনোখানে আবার হয়তো বা হাস্যপরিহাসের আলিম্পন। নানা গুণের বাহারি সমবায়ে এ এমন এক সৃষ্টি যার কোনো ধরাবাঁধা বা নিশ্চিত লক্ষ্য বলে কিছু নেই। প্রগলভতা ও চাপল্যের খানিক বৈঠকি চালে তা দিব্যি জমে ওঠে।

কথা বলার সহজ, সরস, মজলিশি ভঙ্গিতে রম্যরচনার অনবদ্য রূপকার মুজতবা আলি। ভাষা ও ভঙ্গির রম্যতায় অত্যন্ত সাধারণ বিষয়ও মুজতবার কলমে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। তাঁর দেশে-বিদেশে ভ্রমণ কাহিনির আদলে রচিত এক উচ্চাঙ্গের রম্যরচনা। চাচা কাহিনী ও পঞ্চতন্ত্র-র রচয়িতা বাংলা ভাষায় কৌতুকরসসিক্ত গদ্যের এক মনমাতানো শিল্পী। মুজতবার

পূর্বসূরিদের মধ্যে বিশিষ্টতম রম্যরচয়িতা সম্ভবত প্রমথ চৌধুরী। শানিত 'উইট'-এর বর্ণদীপ্তিতে প্রমথ চৌধুরী 'বীরবল'-এর অবগুণ্ঠনে সৃষ্টি করেছিলেন এক রচিসম্মত, মূলত বক্রোক্তিনির্ভর, রম্য গদ্য। প্রমথ চৌধুরীর কথারীতির সুতীক্ষ্ণ সরসতার ধারাটিই প্রাধান্য পেয়েছিলো উত্তরকালের মুজতবা আলির রচনায়।

● রম্যরচনার বৈশিষ্ট্যসমূহ :

১. হালকা বৈঠকি চালে, ঘরোয়া মেজাজে, লঘু হাস্যরসাত্মক, রম্য কল্পনার স্পর্শযুক্ত যে কোনো গদ্যরচনাকেই 'রম্যরচনা' বলা যায়।

২. রবীন্দ্রনাথের মতে রম্যরচনা হলো 'বাজে কথা'-র রচনা—'অন্য খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায়। কারণ মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়ম অনুসারে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে। যেমন বাজে খরচ, তেমনি বাজে কথা। বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়।' এই মন্তব্যের আলোকে দেখলে নির্ভার, স্বচ্ছন্দ, খেয়ালি কল্পনার সর্ববন্ধনমুক্ত রম্যতাই এ-জাতীয় রচনার চরিত্র-লক্ষণ।

৩. ভার-বর্জনের প্রয়াস যেমন থাকবে ভাষা ও আঙ্গিকে, তেমনই থাকবে বিষয়েও। কোনো গভীর তত্ত্বকথা প্রকাশের তাগিদ বা পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের বাসনা যেমন থাকবে না, ভাষা-ভঙ্গি তেমনই স্বচ্ছন্দ স্বাধীন গতিতে চলবে কোনো স্থির অনুশাসনের পরোয়া না করে।

৪. লেখক ও পাঠকের নিবিড় সান্নিধ্য ও লঘু-সরস আড্ডাই রম্যরচনার প্রাণ। মজলিসি মেজাজ না থাকলে এ রচনার উপভোগ্যতাই হারিয়ে যায়।

৫. দরকারি বিষয়ের গম্ভীর আলোচনা/বিশ্লেষণের পরিবর্তে মজলিসি আলাপচারিতাই রম্যরচনায় প্রত্যাশিত।

● রম্যরচনা, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ও ছোটগল্প :

প্রসঙ্গের জনক ফরাসি লেখক মোঁতেনের মন্তব্যটি স্মরণ করলে মনে হতে পারে যে 'রম্যরচনা', ব্যক্তিগত বা আত্মগৌরবী প্রবন্ধেরই নামান্তর— 'Reader, myself am the matter of my work' তবে এ-দুটি অভিধাকে অভিন্ন মনে করা সঙ্গত নয়। যে-কোনো ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লঘু চপল কল্পনার রঙে রঞ্জিত হলে তাকে 'রম্যরচনা' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে বটে, তবে কেবলমাত্র রমণীয়তার গুণেই কোনো রচনা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের গোত্রভুক্ত হতে পারে না। নৈর্ব্যক্তিক বা বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধেও রমণীয়তার ছাপ থাকা সম্ভব এবং সে-কারণে তেমন কোনো রচনাও 'রম্যরচনার' অভিধা দাবি করতে পারে। অবশ্য এ-কথা সাধারণভাবে স্বীকার্য যে, ব্যক্তিগত প্রবন্ধে রম্যরচনার লক্ষণগুলি চর্চিত হবার সম্ভাবনা ও সুযোগ বেশি। বিষয় ও আঙ্গিকগত ভারশূন্যতার কারণে রম্যরচনা প্রবন্ধের চেয়ে বেশি উপভোগ্য, স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ ও গতিময়। রঙ্গরস, হালকা কৌতুকপরতা অর্থাৎ 'fun' বা 'humour' রম্যরচনার গুণবিচারে একটি আবশ্যিক শর্ত। বিষয়নিষ্ঠ, যুক্তিশৃঙ্খলা-শাসিত প্রবন্ধে তেমন স্বতঃস্ফূর্ত সরস স্নিগ্ধতার অবকাশ কম ; সব ধরনের ব্যক্তিগত প্রবন্ধেও ত' পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে না।

অনেক রম্যরচনাতে ছোটগল্পের উপকরণ থাকতে পারে। তবে ছোটগল্প একটি সুসংহত, সুশৃঙ্খল আঙ্গিক যা আখ্যান ও শৈলীর সচেতন সমন্বয়ে সার্থক। রম্যরচনা তুলনায় বন্ধনমুক্ত, আপন খেয়ালি চাপল্যে সঞ্চরমান। ছোটগল্পের ঘনসংবদ্ধতা ও সমগ্রের ঐক্য প্রতীতি তার লক্ষ্য নয়। তাছাড়া এক্ষেত্রেও মজলিশি রঙ্গরসের কৌতুকস্পর্শ আবশ্যিক শর্ত বলে গণ্য হতে পারে না। কখনো কখনো রম্যরচনা তাই ছোটগল্প সদৃশ হলেও এ-দুয়ের গোত্র ভিন্ন।

কেবলমাত্র রম্যতার গুণেই যে-কোনো প্রবন্ধ কি 'রম্যরচনা' বলে বিবেচিত হতে পারে? এর উত্তরে মোটের ওপর 'না' বললেও সুরম্য প্রবন্ধ ও রম্যরচনার তফাতটি নিশ্চিতভাবে

চিহ্নিত করা কঠিন। ছোটদের উপযোগী করে লেখা রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনা বিশ্বপরিচয়-কে 'রম্যরচনা' বলা যেতে পারে কি? ভাষার সরস রমণীয়তা ছাড়াও অন্যান্য দেখতে হবে আড্ডা বা মজলিসের বৈঠকি চাল, আলাপ্য বিষয়ের স্বতঃস্ফূর্ত নির্ভার ছন্দ ও শিথিল গতি, সেন্স অব হিউমার, পাঠক/শ্রোতার সঙ্গে লেখকের খোলামেলা আলাপচারিতা ইত্যাদি। কথোপকথন, নকশা, কড়চা, পত্র, জার্নাল প্রভৃতি নানা আঙ্গিকেই রম্যরচনার রূপটি প্রকাশিত হতে পারে। কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম পাঁচার নক্শা, বীরবলের তেল-নুন-লকড়ী, বীরবলের হালখাতা, মুজতবা আলির চাচা কাহিনী ও পঞ্চতন্ত্র, যাযাবরের দৃষ্টিপাত, বুদ্ধদেব বসুর হঠাৎ আলোর ঝলকানি গ্রন্থভুক্ত 'হাইড ষ্ট্রিট টক' বিনয় ঘোষের আসর্পেটর নক্শা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সুনন্দর জার্নাল, গৌরকিশোর ঘোষের রূপদর্শীর নক্শা, নীললোহিত, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, অজিতকৃষ্ণ বসু, হিমানীশ গোস্বামী, তারাপদ রায়, প্রভৃতি গুণী মানুষের বহু সরস নিবন্ধ 'রম্যরচনা' রূপে স্বীকৃত।

'দেশ' পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত একটি রচনার অংশবিশেষ নীচে উদ্ধৃত হলো যা থেকে পাঠক রম্যরচনার স্বাদটি বুঝে নিতে পারবেন :

> "...এক কালে এই দেশ কত কুসংস্কার প্রস্তুত করত। সেই কুসংস্কারের সেই অঢেল প্রাচুর্যের দিনে কেবল আমাদের দেশের আপামর ধনীদরিদ্র, আধা ধনী কিংবা আধা দরিদ্র, নারী এবং শিশু, পশু এবং পক্ষী, জন্তু এবং জানোয়ার, অমন কিংবা অন্যেরা প্রত্যেকেই ট্যাঁকে বা পকেটে কয়েক ওজন করে কুসংস্কার জমা থাকত তাই নয়, দরকার মতো আমরা কুসংস্কার বস্তায় বস্তায় বিদেশে চালানও করবার মতো অবস্থায় ছিলাম।
>
> কিন্তু হায়, সে দিন গিয়াছে। যেখানে রামায়ণের আমলে আমাদের দেশে কুসংস্কারের সংখ্যা ছিল মাথাপিছু অন্তত ১২০৫, মহাভারতের আমলে সেই কুসংস্কার কমে দাঁড়ায় মাথা পিছু (অর্থাৎ মাথাপিছু) ৭৩১, রাজা অশোকের আমলে, অতীব দুঃখের কথা, কুসংস্কারের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র পিঃ মাত্র ১২১ টিতে। ... আকবরের আমলে তাঁর একক প্রচেষ্টায় মাথা পিছু কুসংস্কার বাড়ানো হয় এবং তা দাঁড়ায় ১৯৩টিতে।"
>
> [হিমানীশ গোস্বামী, আরও কুসংস্কার চাই।]

॥ সমালোচনা সাহিত্য ॥

সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য :

সবশেষে আসছি সমালোচনা সাহিত্য প্রসঙ্গে। একটি গল্প বা কবিতা, উপন্যাস বা নাটক একজন সাধারণ পাঠক পড়েন তার রস আস্বাদন করতে, তার আনন্দ উপভোগ করতে ; অথবা বিনোদন অথবা মনের খানিক খোরাক সংগ্রহ করাই তার অভিপ্রায়। তিনি বড় জোর তাঁর ভালো-লাগা বা না-লাগার কথা বলেন। অন্যদিকে একজন সমালোচক একটি শিল্পকর্মকে বিচার ও বিশ্লেষণ করেন অনেক নিবিড়ভাবে। একটি রচনার ভাব ও বিষয়বস্তু, তার ভাষা, ভঙ্গি, রচয়িতার মানসদৃষ্টি ইত্যাদি নানা বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন তিনি। তাঁর ভালো-লাগা বা না-লাগাকে সম্যকভাবে ব্যক্ত করেন তিনি। শিল্প-সাহিত্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচারমূলক এক সম্যক মূল্যায়ন বা আলোচনাই সমালোচনা (Criticism) বলে গণ্য হয়ে থাকে। সাহিত্যরচনা ও পাঠ/উপভোগের পরেই শুরু হয় সাহিত্যবিচার তথা মূল্যায়নের। সেই প্রয়াসের ফলশ্রুতি সমালোচনা-সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রামায়ণী কথা'-র ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন যে '...যথার্থ সমালোচনা পূজা, সমালোচক পূজারি পুরোহিত, তিনি নিজের অথবা সর্বসাধারণের ভক্তি-বিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র।' তবে সমালোচকের সহৃদয় উদারতা থাকতে হবে

Scanned with CamScanner

একথা স্বীকার করেও বলা চলে যে, সমালোচনা অবশ্যই নিঃশর্তভাবে স্তুতিমূলক হবে এমন প্রস্তাব সর্বতোগ্রাহ্য নয়।

চলতি কথায় 'সমালোচনা' বলতে মনোভাবের বিরূপতা, এমনকি ছিদ্রান্বেষণও বোঝায়। সাহিত্যে 'সমালোচনা' কিন্তু এক সামগ্রিক, যুক্তিগ্রাহ্য, নিরপেক্ষ মূল্যায়ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাহিত্যে 'সমালোচনা' কিন্তু এমনভাবে আবিষ্ট করা সঙ্গত নয় যে, মতপার্থক্য ব্যক্তিমানসের প্রচ্ছায়ায় সমালোচনাকে এমনভাবে আবিষ্ট করা সঙ্গত নয় যে, মতপার্থক্য তিক্ততায় পর্যবসিত হবে। পক্ষপাতদুষ্ট আক্রোশ ও রসবোধের অভাবহেতু সমালোচনা একবগ্গা ও বৈরী হতে পারে ; আবার সমালোচকের নিজস্ব পছন্দের কারণে কোনো রচনা বা তার লেখক সম্পর্কে তিনি অযৌক্তিক উচ্ছ্বাস দেখাতে পারেন। এর কোনোটিই আদর্শ সমালোচনা বলে বিবেচিত হতে পারে না। সমালোচক তাঁর পাঠ ও পর্যালোচনায় স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি আশ্রয় করবেন সেটাই স্বাভাবিক, তবে নিছক তাঁর ব্যক্তিগত রুচি ও ভালো মন্দ লাগার ভিত্তিতেই একটি সাহিত্যকর্মের মূল্য চূড়ান্তভাবে নিরূপিত হবে তা হতে পারে না। অর্থাৎ সমালোচকদের থাকতে হবে সহৃদয়তা, উদারতা এবং সর্বোপরি রসবোধ, যা না থাকলে শিল্প-সাহিত্যের আনন্দ ও সৌন্দর্যকে সম্যক অনুধাবন করা অসম্ভব। এ সব গুণের সমাহারে সমালোচক একটি শিল্পকর্মকে পাঠকদের কাছে বিশদভাবে মেলে ধরবেন। 'সমালোচনা' তাই সাহিত্যের একটি শ্রেণীবিভাগ রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। Richard Dutton-এর সংজ্ঞায় 'সমালোচনা' হলো 'the understanding and appreciation of literary texts.' আর সমালোচনায় সমালোচকই মুখ্য। সাহিত্যের মূল্যবিচার ও পাঠকবর্গের সঙ্গে মূল্য বিনিময়ে তিনিই মূল কর্তা। Abercrombie-র ব্যাখ্যা 'The criticism of literature is often as entirely individual as the creation of literature, and as much the work of undeniable genius.' সাহিত্য সৃষ্টির ভাব ও ভাষাগত তাৎপর্য, তার উদ্দেশ্য ও মূল্যের সম্যক বিচার পাঠকবর্গের গোচরীভূত করা সমালোচকের দায়িত্ব। Abercrombie-র ভাষায় সমালোচকের কাজ হলো 'discover the purpose, judge its worth, criticize the technique'. সাহিত্য-সমালোচক কিভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন সে বিষয়ে সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমালোচনার কথা'-র এই পংক্তিগুলি স্মর্তব্য : 'ব্যক্তিগত ভাল লাগার ভাবোচ্ছ্বাস বা ভাল না লাগার নিরুচ্ছ্বাস নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন না ; তিনি যথাসম্ভব নিস্পৃহ, নিরাসক্ত ও বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য বিচারে এমনভাবে প্রবৃত্ত হবেন যাতে পাঠকের সঙ্গে সাহিত্যের প্রাথমিক পরিচয় ঘটতে কোন বাধা, কোন আরোপিত নিয়মকানুনের বাঁধন না পড়ে।' সাহিত্য সমালোচনায় যথোচিত সিদ্ধির ব্রতে সমালোচকের দশটি গুণের উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়—'ভূয়োদর্শন, আত্মসমালোচনা, সতর্কতা ও পরমতসহিষ্ণুতা, লেখকের প্রতি সহানুভূতি, মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান, দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি, বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য, যৌক্তিকতার প্রতি নিষ্ঠা, নিস্পৃহতা, লেখকের চিত্তভূমিতে অধিষ্ঠিত হবার স্বাভাবিক সামর্থ্য।'

একজন আদর্শ সমালোচক তাঁর ব্যক্তিগত সংস্কার, পাণ্ডিত্যের অভিমান এবং অহমিকার দ্বারা পরিচালিত হন না। তিনি শিক্ষিত মন ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হন। এজন্য তাঁকে শিল্প-সাহিত্য জগতের মূল নীতিগুলি গভীরভাবে জানতে হয়, অবাধে বিচরণ করতে হয় গ্রন্থরাজ্যে, নিজেকে তৃপ্ত হতে হয় ও পাঠকসাধারণে সঠিক রুচি তৈরি করতে হয়। সাহিত্যের তত্ত্ব ও নীতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়ে স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় তিনি পাঠকের রসাস্বাদন ও উপলব্ধির সহায়ক হয়ে ওঠেন। নিরপেক্ষতা, সামগ্রিকতা ও ভারসাম্যের গুণে সার্থক 'সমালোচনা'য় সমালোচকেরও আত্মমুক্তি ঘটে।

সমালোচনা : মূল প্রবণতা, বিবিধ পদ্ধতি :

সাহিত্য-সমালোচনার মূল দুটি প্রবণতা। একটি রোমান্টিক, আর অন্যটি ক্ল্যাসিকাল। ব্যক্তিগত আবেগ যদি সমালোচনার পদ্ধতি ও সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রণ করে তবে তাকে বলা যায় রোমান্টিক ; সমালোচকের অন্তরাত্মা এক্ষেত্রে কবি বা লেখকের সৃজনীপ্রতিভার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে। অন্যপক্ষে যারা সাহিত্যের বিচারে নিয়ম-নীতি সঠিকভাবে মেনে চলার পক্ষপাতী তাদের সমালোচনা ক্ল্যাসিকাল। সাহিত্যকে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও ঐতিহ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে তাঁরা মূল্যবিচারে প্রবৃত্ত হন। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য যদি রোমান্টিক সমালোচনা-পদ্ধতির উদাহরণ বলে মনে করি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মেঘদূত তাহলে সনাতন-বিধিসম্মত আলোচনা রূপে গণ্য হবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমালোচনা সাহিত্যের দিকে তাকালে যে-সব বিভিন্ন সমালোচনা পদ্ধতি নজরে পড়ে সেগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কাব্য-কবিতার সমালোচনায় একদল সমালোচক শব্দ, চিত্রকল্প, অলঙ্কার ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপ নির্ণয় করতে চান। এ-ধরনের পদ্ধতিকে বলা হয় বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) পদ্ধতি। যে সমালোচনা যুগচিত্র, পরিবেশ-পরিপার্শ্ব ইত্যাদির নিরিখে সাহিত্যের বিচার করে থাকে তাকে চিহ্নিত করা হয় ঐতিহাসিক (Historical) সমালোচনা পদ্ধতি রূপে। এছাড়া রয়েছে ব্যক্তিগত (Personal) ও মনোবিশ্লেষণী (Psychoanalytical) পদ্ধতি। সমালোচক যদি কোনো সাহিত্যকর্মের মূল্যায়নে তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তা ও পছন্দকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেন তবে তাকে ব্যক্তিগত সমালোচনা-রীতি বলে ধরা হবে। মনস্তাত্ত্বিক বা মনোবিশ্লেষণী পদ্ধতিতে সমালোচক লেখকের মন ও মানসিকতার প্রতিফলন খোঁজেন সাহিত্যকর্মে। তত্ত্বসন্ধানী (Philosophical) পদ্ধতিতে একটি রচনার মধ্যে কোন্ সত্য নিহিত আছে অথবা তার সৌন্দর্য বা রসতত্ত্বের স্বরূপই বা কি তার সন্ধানে ব্রতী হন সমালোচক। তুলনামূলক (Comparative) সমালোচনা বলে আর এক পদ্ধতি রয়েছে যেখানে ভাব, বিষয়, শব্দ সম্পদের তুলনামূলক বিচারের দ্বারা পারস্পরিক উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নিরূপিত হয়। এছাড়া আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনায় নানা নতুন পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তদনুযায়ী সমালোচক গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করছেন। নাম করা যেতে পারে পরিসংখ্যানমূলক সমালোচনা পদ্ধতি (Statistical Method), ইমপ্রেশনিস্ট সমালোচনা (Impressionist Criticism) পদ্ধতি, ব্যবহারিক সমালোচনা (Practical Criticism) পদ্ধতি, মার্কসবাদী (Marxist) সমালোচনা-পদ্ধতি, বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা পদ্ধতি (Objective Criticism), পাঠক-কেন্দ্রিক (Reader-Response Criticism) সমালোচনা পদ্ধতি ইত্যাদির।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য সমালোচনার ধারা :

প্রাচীন কাল থেকেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাহিত্যবেত্তা, অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ ও নন্দনতাত্ত্বিকেরা সাহিত্যবিচারে টীকা/ভাষ্য রচনা করেছেন ; কাব্য, নাটক ইত্যাকার সৃজনশীল বিষয়ে মূল্যায়নের মাপকাঠি নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। তুলনায় 'সমালোচনা' ও তার প্রতিশব্দ 'criticism' আধুনিক। Criticism-কে একালের অভিধানকার মার্টিন গ্রে সংজ্ঞায়িত করেছেন এইভাবে—"the interpretation, analysis, classification, and ultimately judgement of works of literature, which has become a kind of literary genre itself."

মহাকবি কালিদাসের আমল থেকে 'চর্যাপদ' পর্যন্ত সাহিত্যের ভাষ্য হিসেবে টীকাকারদের রচনা ছিলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে প্রাচ্য সমালোচনা সাহিত্যের বিচিত্র ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছিল

Scanned with CamScanner

... থেকে যাবে।

জীবনী সাহিত্য :

প্রথমেই জীবনী-সাহিত্য প্রসঙ্গে আসি। জীবনী বা Biography বলতে সাধারণভাবে আমরা কোনো ব্যক্তিবিশেষের জীবনবৃত্তান্তকে সুবিন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধ করা ও তার চরিত্রের বিশ্লেষণ, এই বুঝে থাকি। আর একটু সাঠকভাবে বলতে গেলে, জীবনচরিতে বাইরের ঘটনাবলীর বিশ্বাসযোগ্য চিত্রণের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্জীবনের দ্বন্দ্ব-সংকটের প্রতিফলন থাকবে, থাকবে মানসিকতার বিশ্লেষণ ; আবার একটি ব্যক্তিজীবনকে তার সময় ও যুগের প্রেক্ষিতে স্থাপন করে ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির তথা পারিপার্শ্বিকের সম্পর্কও যথাযথভাবে উন্মোচন করতে হবে। তথ্যভূয়িষ্ঠ হওয়া ছাড়াও জীবনচরিতের উত্তরণ ঘটা প্রয়োজন সাহিত্যের রসলোকে।

কোনো ব্যক্তিবিশেষের জীবনের আদ্যোপান্ত যাবতীয় ঘটনা ও তথ্য স্তূপীকৃত করলেই জীবনচরিত হয় না। লিটন স্ট্র্যাচি তাই ঠাট্টা করে বলেছেন—'A mass of notes and documents is no more a biography than a mountain of eggs an omelette.' জীবনীকার এমনভাবে তথ্য সংগ্রহ করবেন ও এমনভাবে তা বিচার, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করবেন যে, মানুষটির অন্তর পুরুষটির যেন একটি বিশ্বস্ত ও রসগ্রাহী ছবি ফুটে ওঠে। ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের দৃষ্টিতে জীবনী নিছক ব্যক্তিজীবনের ইতিহাস নয়—"Biography is not only history. It can also be good literature. And in some cases it can even rank with creative literature". জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের বাইরের ও ভেতরের সমগ্র

সত্তাকে শিল্পসম্মতভাবে উদ্‌ঘাটিত করার দায়িত্ব জীবনীকারের। হেমকেথ পিয়ার্সন বলেছেন :

> "Biography is the history of the lives of individual men—a truthful record of an individual and composed as a work of art. It is the narrative from birth to death, of one man's life in its outward manifestations and inward workings."

আঁদ্রে মুরোর ভাষায় জীবনের মধ্যে দিয়ে একটি মানবাত্মার দুঃসাহসিক অভিযানের আলেখ্যই হল প্রকৃত জীবনচরিত—"Biography is that type of writing which reveals, in narrative form, the outer and inner experiences of one personality through another. It is the study and presentment of a human character with its inner conflict of aim and impulse and its outer struggle between circumstance and temperament. In short, it is the faithful portrait of a soul in its adventures through life." মুরোর এই পর্যবেক্ষণটি বিশেষ অর্থবহ ও গভীর। জীবনের নানা ঘটনা ও তথ্যের ওপর ভিত্তি করে মানবাত্মার দুঃসাহসিক অভিযানের আলেখ্য নির্মাণ প্রকৃতই দুরূহ এক সৃজনীকর্ম, বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ ও শৈল্পিক দক্ষতার সার্থক পরিণয় ব্যতীত যা অসম্ভব। লুই মামফোর্ড তাই বলেছেন—'Biography is both a science and an art.' এ-কাজ ঠিক কতটা কঠিন বোঝা যাবে প্রখ্যাত জীবনীকার এমিল লুডউইগের কথা থেকে—'To re-create by-gone scenes and figures, to re-animate with movement, proportion and climax the stubborn facts of a man's or woman's whole existence, requires a dramatic sense equal if not superior to that of the playwright or a novelist.' অর্থাৎ একজন জীবনীকারকে একাধারে হতে হবে ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং চিত্রকর ; শুধু জীবনের ঘটনাবলীই নয়, তাঁকে উদ্‌ঘাটিত করতে হবে জীবনরহস্যকেও ; বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের সুসমঞ্জস নির্মাণ, ইতিহাসের শিল্পসম্মত রসায়ন ব্যতিরেকে কোনো জীবনচরিতই সার্থক হতে পারে না।

ব্যক্তিত্বের ইতিহাস জীবনচরিতের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। সে-কারণে তাকে তো তথ্যভূয়িষ্ঠ হতেই হবে। তবে জীবনীকার নিছক তথ্যবেত্তা বা Chronicler নয় ; ব্যক্তিত্বের গভীর অনুশীলনের ছাপ যদি তাঁর লেখায় না থাকে, যদি তিনি একটি চরিত্রে নিজস্ব কল্পনায় রক্তমাংসের সজীবতা আরোপ করতে না পারেন, পাঠক যদি সেই জীবনের গভীরে প্রবেশ করে তার সমগ্র সত্তাকে তার নিজের অনুভবের বলয়ে না আনতে পারেন, তাহলে তাঁর কাজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য হবে। জীবনচরিতে কাহিনি থাকে, তবে তা কাহিনিসর্বস্ব হতে পারে না, কারণ জীবনের প্রতিকৃতির অন্তরালে জীবনরহস্য বিশ্লেষিত হওয়াটাও জরুরি। কেবলমাত্র ঘটনার সারিবদ্ধ বিন্যাসে জীবনী যে সার্থক রূপ পায় না, সমারসেট মমের নিম্নোক্ত মন্তব্যে তার পরিষ্কার উল্লেখ আছে : "A biography which is merely anecdotal is not biography at all. An anecdote is indispensable, but to have any real biographical value, an anecdote must reveal the true nature of the man."

এই প্রসঙ্গে অবশ্যই মনে পড়ে যায় ইংরেজি ভাষায় লেখা সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থ জেমস বসওয়েলের *The Life of Samuel Johnson*-এর কথা। দেশ-কাল নিরপেক্ষভাবে আদর্শ জীবনীকার বসওয়েল জনসনের জীবনের, বিশেষ করে তাঁর শেষ কুড়ি বছরের, যে জীবন্ত ছবি তুলে ধরেছেন তা অবিশ্বাস্য। বসওয়েল-কৃত জীবনচরিত কাহিনিমূলক এবং তথ্যবহুল,

কিন্তু প্রতিটি কাহিনি ও তথ্যের ভেতর দিয়ে মানুষ জনসনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ যেভাবে তুলে ধরেছেন তাতে বিস্মিত হতে হয়। বসওয়েল যাঁর জীবনি রচনা করেছিলেন সেই স্যামুয়েল জনসন ইংরেজ কবিদের জীবনচরিত লিখেছিলেন। তাঁর সেই বিখ্যাত *The Lives of the Poets*-এ আব্রাহাম কাউলী, ড্রাইডেন, পোপ প্রমুখ অনেক ইংরেজ কবির জীবনী জনসনের অননুকরণীয় গদ্যভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। জনসন জীবনচরিতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—"The business of the biographer is often to pass slightly over those performances and incidents which produce popular greatness, to lead the thoughts into domestic privacies, and display the minute details of daily life, where exterior appendages are cast aside, and men excel each after only by prudence and virtue." অর্থাৎ জীবনচরিত যাঁকে নিয়ে লেখা হবে তাঁর জীবনের আনুপূর্বিক পরিচয় জীবনীকারকে পেতে হবে, এবং তিনি কাহিনি এমনভাবে সাজাবেন যাতে করে মানুষটির জীবনের বাইরের ও ভেতরের চেহারাটি পাঠকের মনের পর্দায় সমানভাবে প্রতিভাত হয়। জীবনচরিত তো সে-কারণেই রসোত্তীর্ণ সাহিত্যসৃষ্টি।

প্রাচীন ধ্রুপদী সাহিত্যে জীবনীসাহিত্যের জনক বলা যেতে পারে প্লুতার্ককে যাঁর সুবিখ্যাত *Lives* গ্রন্থে আছে ছেচল্লিশ জন বরেণ্য গ্রিক ও রোমক পুরুষের জীবনী। অপ্রত্যয় তথ্যনিষ্ঠা ও ব্যক্তিত্বের উদ্ভাসে তিনি সৎ ও মহৎ মানুষের বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন। প্লুতার্কের এই জীবনী গ্রন্থের অনুবাদ এলিজাবেথীয় ইংল্যাণ্ডে সাহিত্যরচনার অন্যতম আকরগ্রন্থরূপে সমাদৃত হয়েছিলো। বিশেষত শেক্‌স্‌পীয়ার তাঁর নাট্যরচনায় ছিলেন প্লুতার্কের কাছে ঋণী।

ভিক্টোরীয় যুগের চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক কার্লাইল জীবনচরিত লেখক রূপে আমাদের মনোযোগ দাবি করে থাকেন তাঁর *The Life of John Sterling* এবং *Frederick the Great*-এর জন্যে। দ্বিতীয়টি কার্লাইলের প্রচুর শ্রম ও চর্চার ফলশ্রুতি এবং একটি কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বকে চিত্রিত করার প্রশংসনীয় উদ্যম, যদিও ব্যক্তির চাইতে সমষ্টি ও ইতিহাসই যেন সেখানে বড় হয়ে উঠেছে। আধুনিক জীবনীসাহিত্যে প্রকৃতই সাড়া জেগে দিয়েছিলেন লিটন স্ট্রাচি, এক নিরাসক্ত, নির্মোহ, পক্ষপাতমুক্ত দৃষ্টিতে বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী রচনায় সূচনা করে। তাঁর *Eminent Victorians* ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হলে জীবনী রচনার ধারা বেগ পাল্টে। জীবনীকার কেবল সশ্রদ্ধচিত্তে বিখ্যাত ব্যক্তিদের এমন প্রতিকৃতি নির্মাণ করতেন যা উজ্জ্বল, মর্যাদামণ্ডিত ও সমীহ আদায়কারী—স্ট্রাচির আবির্ভাবে এই ভিক্টোরীয় রক্ষণশীলতা ও অর্ধসত্যচর্চা ভেঙে গেল। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, কার্ডিনাল ম্যানিং, টমাস আরনল্ড, জেনারেল গর্ডনের মতো ব্যক্তিবর্গের যে জীবনবৃত্তান্ত, আমরা *Eminent Victorians*-এ পেলাম তা ছিলো আক্রমণাত্মক ও প্রথাবিরোধী জীবনীরচনার প্রথম উদাহরণ। স্ট্রাচি মনে করতেন যে জীবনীকার তাঁর বিষয় সম্পর্কে আক্রমণের মেজাজে থাকবেন ('attack his subject in unexpected places') এবং হঠাৎই গোপন ফাঁক-ফোকরে আলো ফেলবেন ('shoot a sudden, revealing searchlight into obscure recesses')। অন্যান্য জীবনীগ্রন্থ যথা *Queen Victoria, Books and Characters : French and English, Portraits in Miniature* ইত্যাদি স্ট্রাচিকে বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ জীবনী রচয়িতার আসনে অভিষিক্ত করেছে। মধ্যযুগীয় চরিত-সাহিত্যের

বাংলা সাহিত্যে জীবনচরিতের বিভাগটি তেমন সমৃদ্ধ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে বিপরীতে বাংলা জীবনী রচনাকে নতুন মাত্রা দিতে চেয়েছিলেন দেবতা হিসেবে পূজিত একটি প্রত্ন-ইতিহাস উদ্ধারে যত্নশীল হলেও বঙ্কিম বেছে নিয়েছিলেন

চরিত্রকে। আধুনিক জীবনীসাহিত্যের নিদর্শন তাই একে বলা যাবে না। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ চরিত্রকে। আধুনিক জীবনীসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনায় হাত দেননি ; যদিও রবীন্দ্রনাথের রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত রচনায় এবং বঙ্কিমের লেখা ঈশ্বর গুপ্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের জীবনবিষয়ক আলোচনায় জীবনচরিত রচনার বহু মূল্যবান নির্দেশ ছিলো। একালের সাহিত্যিকদের মধ্যে জীবনীরচনায় আগ্রহ দেখিয়েছিলেন মোহিতলাল মজুমদার। তাঁর বঙ্কিম বরণ ও শ্রীমধুসূদন কাহিনিমূলক জীবনকথা নয়, দুই প্রতিভার ভাবজীবনের আলোচনাই তাতে প্রাধান্য পেয়েছে। মোহিতলালের অপর জীবনচরিত জয়তু নেতাজী তেমন উপভোগ্য নয়। ভাবজীবনের সঙ্গে সঙ্গে নেতাজির কর্মজীবন এখানে গুরুত্ব পায়নি। মোহিতলালের পরই নাম করতে হয় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর। অচিন্ত্যকুমার একজন প্রতিভাবান গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। কথাসাহিত্যের আকর্ষণীয় ঢঙে তিনি লিখেছেন তাঁর বিশেষ জনপ্রিয় জীবনীগ্রন্থ পরম পুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ। তবে 'পরমপুরুষ' নিখুঁত জীবনী নয় ; বরং স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ অবলম্বনে রচিত এক সাহিত্যকর্ম হিসেবেই একে গণ্য করতে হবে। পরবর্তীকালে অচিন্ত্যকুমার আরও কয়েকটি জীবনী রচনা করেন, যথা, বীরেশ্বর বিবেকানন্দ, উদ্যত খড়্গ (নেতাজী জীবনী) ও জ্যৈষ্ঠের ঝড় (নজরুল জীবনী)। একই ব্যক্তির জীবন নিয়ে একাধিক জীবনচরিত প্রণীত হয়েছে দেশে বিদেশে। বিবেকানন্দকে নিয়ে অচিন্ত্যকুমারের আগেই লিখেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার বিবেকানন্দ চরিত, বিদ্যাসাগরের জীবন নিয়ে লেখা হয়েছিল দুটি বিপুলায়তন জীবনী—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যাসাগর চরিত ও সুবলচন্দ্র মিত্রের বিদ্যাসাগর। সাম্প্রতিককালে বিদ্যাসাগর-জীবন অবলম্বনে লিখেছেন নমিতা চক্রবর্তী, সন্তোষকুমার অধিকারী এবং ইন্দ্র মিত্র। রামমোহন চরিত্রটিও বাঙালি লেখকদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়-এর পর থেকে অজস্রবার রামমোহনকে নিয়ে ছোট-বড় জীবনী লেখা হয়েছে। এগুলির মধ্যে মণি বাগচির রামমোহন বিশেষ সুখপাঠ্য। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির এক বর্ণময় ব্যক্তিত্ব মাইকেল মধুসূদন। তাঁকে নিয়ে প্রথম জীবনী লেখেন যোগীন্দ্রনাথ বসু। এছাড়াও লিখেছেন প্রমথনাথ বিশী, শীতাংশু মৈত্র, মণি বাগচি প্রমুখ। আধুনিক বাংলা জীবনী সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা আলোচিত গ্রন্থ নিঃসন্দেহে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিশাল ও পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রজীবনী। রবীন্দ্রানুরাগী ও গবেষকদের কাছে প্রভাতকুমারের লেখা এই জীবনী এক আকরগ্রন্থ।

মধ্যযুগে চৈতন্যদেব ও তাঁর পার্ষদদের নিয়ে যেসব জীবনীকাব্য রচিত হয়েছিলো সেগুলি কাব্য হিসেবে ঐশ্বর্যমণ্ডিত হলেও পদ্যমাধ্যমে এইসব আখ্যানধর্মী কাব্য মূলত ভক্তিরসাত্মক, মহৎ সন্তজীবনের অলৌকিক মাহাত্ম্যের কীর্তন। চৈতন্যভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য-মঙ্গল, গৌরাঙ্গবিজয় ইত্যাদি জীবনীকাব্যগুলি ততোখানি প্রামাণিক ও ইতিহাসসম্মত নয়, যতোখানি প্রশস্তিমূলক। এগুলিকে আধুনিক জীবনী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না করে সন্তজীবনী বা Hagiography অভিধায় চিহ্নিত করাই যুক্তিসঙ্গত।

সার্থক জীবনীগ্রন্থের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখনীয় :

১. ব্যক্তিজীবনের কথা সতর্ক তথ্যনিষ্ঠার লিপিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন ;
২. ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সমকালীন সমাজ ও ইতিহাসের প্রামাণিক চিত্র তাতে থাকতে হবে ;
৩. জীবনী নিছক তথ্য ও ঘটনার কালানুক্রমিক বিবরণ নয়। তাতে কথাসাহিত্যের রস ও উপভোগ্যতা বিশেষভাবে কাম্য।

৪. ব্যক্তির জীবনচিত্র এমনভাবে আঁকতে হবে যাতে পাঠকেরা উৎসাহিত হন। তাছাড়া প্রতিকৃতি-অঙ্কনশিল্পীর সঙ্গে এখানে জীবনীকারের মিল ;
৫. কেন্দ্রীয় চরিত্রের সঙ্গে অন্যান্য চরিত্রের সম্পর্কে, সংঘাত ও সান্নিধ্য যেন বিশ্বাসযোগ্যভাবে চিত্রিত হয় ;
৬. কোনো নীতি বা আদর্শ প্রচারের তাগিদে যেন চরিত্রচিত্রণ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। মহৎ চরিত্রের সৌন্দর্য যেন পাঠককে মুগ্ধ করতে পারে।

কোন বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনকথা অবলম্বনে যেমন জীবনীকার লেখেন জীবনচরিত (biography), তেমনি আবার কেউ নিজেই তাঁর জীবনকাহিনি লিখতে পারেন, যাকে বলা হয় আত্মচরিত (autobiography)। ড. সমুরেন্দ্র জনসন মনে করতেন যে, জীবনচরিত আত্মকৃত হলেই ভালো। তবে অনেক সময় লেখক তাঁর নিজের কথা লিখতে গিয়ে সংযম হারিয়ে ফেলেন ; সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আপন জীবনবৃত্তান্তকে চিত্রিত করতে পারেন না। অকপট ও বস্তুনিষ্ঠ না হয়ে আত্মচরিত হয়ে ওঠে অতিমাত্রায় অহংসর্বস্ব ও আত্মসচেতনতা দোষে দুষ্ট। অন্যদিকে আত্মচরিতকার যদি স্বভাবজাত বিনয় অথবা সলজ্জ কুণ্ঠায় তাঁর জীবনের অনেক অভিজ্ঞতাকে আড়ালে রাখতে সচেষ্ট হন তাহলেও পাঠক সঠিক জীবনবৃত্তান্ত পাঠে বঞ্চিত হবে। আত্মচরিতের প্রাচীন উদাহরণ হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সন্ত অগাস্টাইনের Confessions (আনুমানিক ৪০০ খ্রিস্টাব্দ)। আধুনিক আত্মচরিতরচনার শুরু ফরাসি দার্শনিক রুশোর Confessions দিয়ে, অষ্টাদশ শতকের শেষে। এছাড়া নাম করা যেতে পারে—বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের Autobiography, গিবনের Autobiography, জন স্টুয়ার্ট মিলের Autobiography, গান্ধীর My Experiments with Truth ইত্যাদি। বাংলায় অনুরূপ রচনা হিসেবে স্মরণীয় নবীনচন্দ্র সেনের আমার জীবন, শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমার সাহিত্য জীবন প্রভৃতি। কখনো কখনো আত্মচরিত লেখেন কোন কবি একটি দীর্ঘ কাব্যের রূপে, যেমন ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখেছিলেন The Prelude। আবার কখনো উপন্যাসের আদলে লেখক আত্মচরিতকে করে তোলেন বিশেষ উপভোগ্য, যেমন শার্লট ব্রন্টির Jane Eyre : An Autobiography। আবার ইংরেজ কবি কোলরিজের Biographia Literaria (1817) দু খণ্ডের এক অত্যাশ্চর্য আত্মজৈবনিক রচনা। তথ্যের ভার সরিয়ে রেখে সাহিত্যজীবন, সৃজনরহস্য ও দার্শনিক উপলব্ধির এক আপাত-অগোছালো বিবরণী, যাতে প্রচলিত আত্মজীবনীর সুচারু পূর্ণতা পাওয়া যায় না।

আত্মচরিতে উত্তম পুরুষের বয়ানে চরিত্রকার নিজেকেই উন্মোচিত করেন। কাজটি আদৌ সহজসাধ্য নয়। নিজের কৃতিত্বের কথা আত্মপ্রশংসার মতো পাঠকের হৃদয়গ্রহণের পক্ষে পীড়াদায়ক হয়ে উঠতে পারে। আবার নিজের দোষ-ত্রুটি-ব্যর্থতা অকপটে স্বীকার করার উদার মানসিকতাও সুলভ নয়। এছাড়া অজস্র ঘটনা, নানা চরিত্র, বিচিত্র অভিজ্ঞতাসমূহের মধ্যে থেকে গ্রহণ-বর্জন-বিন্যাস যথাযথ হতে গেলে আত্মজীবনীলেখকের বুদ্ধি বিবেক-বিবেচনা-শিল্পজ্ঞানও যথাযথ হওয়া দরকার। কেবলমাত্র কালানুক্রমিকভাবে সমস্ত ঘটনাকে নথিবদ্ধ করে গেলেই আত্মজীবনী সার্থক হয় না। প্রয়োজনে কালিক পারম্পর্য ভেঙেও চরিত্রকথাকে প্রাসঙ্গিক ও আকর্ষণীয় মাত্রা দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মস্মৃতিমূলক গ্রন্থ জীবনস্মৃতি-তে সেই কথাই বলতে চেয়েছেন —"স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কি বাদ দেয়, কত কি রাখে। কত

বরং রেখে প্রতিকার, অলঙ্করণ করিয়া তোলে। যে অতীতের জিনিসকে পাত্রে ও পাত্রের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত, রাজার কাহারই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।

এছাড়াও জীবনচরিতের আর একটি রূপ দিনপঞ্জী বা রোজনামচা (Diary)। কখনো কখনো লেখক সুসংবদ্ধ আত্মচরিত না লিখে তাঁর জীবনের নানা ঘটনা দৈনন্দিন পরিক্রমার আকারে লিপিবদ্ধ করেন। স্যামুয়েল পেপিস্-এর বিখ্যাত *Diary* এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ১৬৬০-এর পয়লা জানুয়ারী থেকে শুরু করে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পেপিস তাঁর ডায়েরি লিখেছিলেন ৩১-শে মে, ১৬৬৯ পর্যন্ত। মোট ছটি খণ্ডে ম্যাগডালেনের গ্রন্থাগারে এই ডায়েরি রাখা ছিল ; ১৮১৯-এ এর পাঠোদ্ধার করে এই ডায়েরি প্রকাশোপযোগী করেন কেমব্রিজের কলেজ ছাত্র জন স্মিথ। যদিও পেপিসের কর্মময় জীবনের একটি অংশের চিত্র আছে ডায়েরিতে, তবু একান্ত ব্যক্তিগত রচনা হিসেবে এর আকর্ষণ ও সাহিত্য-মূল্য উপেক্ষণীয় নয়। ঠিক এ ধরনের দিনপঞ্জী বা রোজনামচা বাংলা ভাষায় তেমন নেই। তবে শতবর্ষ আগের পুরনো কথা, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের পুরাতন প্রসঙ্গ, মহেশের বক্তৃতাকারের পরবর্তী পর্ব থেকে জ্যোতির্ময়ীর রোজনামচা এবং রবীন্দ্রনাথের য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি—কতকগুলি নাম করা যেতে পারে। এ জাতীয় রচনায় দিন, মাস ও বছরের উল্লেখসহ কালানুক্রমিকভাবে প্রাত্যহিক ঘটনা ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ থাকে। ব্যক্তিগত দিনলিপির অন্তরে ব্যক্তি হয়েও সমকালীন সমাজ-পরিবেশের ছাপ পড়ে তাতে। অনেকটা আত্মজীবনীমূলক ও একান্ত আলাপনের ভঙ্গিতে লেখা হয়ে থাকে এইসব দিনপঞ্জী বা রোজনামচা।

ব্যক্তিমন ও কর্মব্যস্ত মানুষেরা দিনলিপি বা ডায়েরিতে লিখে রাখেন তাঁদের প্রাত্যহিক ইতি-কর্তব্য। সাধারণ মানুষ থেকে শিল্পী-সাহিত্যিক অনেকেই ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করে থাকেন তাঁদের নানা টুকরো অভিজ্ঞতা। কখনো কখনো ডায়েরির সেইসব খসড়া থেকে জন্ম নেয় আত্মচরিত বা স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ। তেমনটি হতে গেলে ব্যক্তির দিনলিপিকে ভাষা-শৈলী-উপস্থাপনার গুণে সর্বজনীন ও সুখপাঠ্য হতে হবে। তাতে আরোপিত হতে হবে যথোচিত সাহিত্যমূল্য। যেমন জার্মানিতে হিটলারের নাৎসি বাহিনীর হাতে অত্যাচারিত ছোট মেয়ে অ্যানা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি। এছাড়া ডায়েরির আঙ্গিকটি গৃহীত হতে পারে গল্প-উপন্যাসে, রহস্য-রোমাঞ্চ-সায়েন্স ফিকসনধর্মী রচনায়। উদাহরণ হিসেবে সত্যজিৎ রায়ের প্রফেসর শঙ্কুর গল্পগুলির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ডায়েরির প্রায় সমগোত্রীয় লঘুভার পত্রীকরণের রীতি জার্নাল। আত্মজৈবনিক রচনায় এ রীতির প্রয়োগ লক্ষণীয়। যেমন বসওয়েলের *Journals* ও শঙ্খ ঘোষের জার্নাল এ-ধরনের আঙ্গিকের নিদর্শনরূপে উল্লেখযোগ্য।

আর এক ধরনের আত্মজীবনীমূলক রচনা **স্মৃতিকথা** বা **memoir**, যেখানে লেখক তাঁর জীবন ও অভিজ্ঞতার বিবরণ তুলে ধরেন। কখনো দীর্ঘ প্রবন্ধ, আবার কখনো উপন্যাসের বিন্যাসে লেখা হয় 'স্মৃতিকথা', যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা কোন বিশেষ অভিজ্ঞতাকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে তুলে ধরতে। নেপোলিয়নের স্মৃতিকথা এই শ্রেণীর রচনা। এছাড়া বিদ্যাসাগরের আত্মচরিত রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, প্রমথ চৌধুরীর আত্মকথা, ভূপেন গাঙ্গুলীর স্মৃতিকথা ইত্যাদি স্মৃতিকথা-র নিদর্শন হিসেবে নাম করা যেতে পারে। 'স্মৃতিকথামূলক উপন্যাস' বা 'memoir novel' হিসেবে উল্লেখযোগ্য জন ক্লেল্যান্ডের *Memoirs of a Woman of Pleasure* এবং থ্যাকারের *The Memoirs of Barry Lyndon*.

২. পত্র বা লিপিসাহিত্য :

এবার আসছি পত্র বা লিপিসাহিত্য প্রসঙ্গে। কোন আত্মীয়, বন্ধু, অনুরাগীর কাছে লেখা সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও সুষমামণ্ডিত চিঠিপত্র এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। চিঠিপত্র এখানে নিছক ব্যক্তিগত সংবাদ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে না থেকে পত্রলেখকের অন্তর্জীবন ও মনোলোকের উন্মোচন ঘটায়। আবেগ ও মননের ঐশ্বর্যে এইসব চিঠির আবেদন হয়ে ওঠে সর্বজনীন। সাহিত্যের এক বিশেষ রূপ হিসেবে 'পত্র-কবিতা' বা 'verse epistle' প্রচলিত ছিল সেই রোমানদের আমলে। অষ্টাদশ শতকে ব্যাপকভাবে রচনায় এই 'epistle' আঙ্গিকের সার্থক ব্যবহার করেছিলেন পোপ। তাঁর *Epistle to Dr. Arbuthnot* এই রূপ-নির্মাণের চমৎকার উদাহরণ। তবে আমরা এখানে 'পত্রসাহিত্য' বলতে সাহিত্যিক গুণযুক্ত চিঠিপত্রকে বোঝাতে চাইছি যার বিখ্যাত নিদর্শন, হলো ভলতেয়ারের পত্রাবলী এবং ড. জনসন, চেস্টারফিল্ড, স্টিভেনসন প্রমুখের চিঠিপত্রাদি। এছাড়া নিতান্ত ব্যক্তিগত পত্রাদির জন্য স্মরণ করতে হয় কীটস, ল্যাম্ব, কিটস ইত্যাদির নাম। বাংলায় রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগত প্রয়োজনের বাইরে চিঠিপত্র লিখেছিলেন, যদিও সবক্ষেত্রেই সেগুলি পত্রসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হবে কিনা বলা শক্ত। নবীনচন্দ্র সেনের প্রবাসের পত্র, মাইকেল মধুসূদনের লেখা কিছু চিঠি, স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিলাতের পত্র ইত্যাদি বাংলা 'লিপিসাহিত্যে'র স্মরণীয় নিদর্শন। আর এ ক্ষেত্রেও সবার ওপরে রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'পত্রসাহিত্য' যেমন আয়তনে ও বৈচিত্র্যে বিপুল, তেমনি কল্পনা, ও কাব্যসৌন্দর্যে যথার্থই অতুলনীয়। তাঁর ছিন্নপত্রাবলী ও ভানুসিংহের পত্রাবলী-তে নানা মানুষজন, প্রকৃতি, জীবন-মৃত্যু সম্পর্কিত চিন্তা, সাহিত্য-শিল্প বিষয়ে নানা ভাবনা ও সেইসঙ্গে কবিব্যক্তিত্বের যে আন্তরিক ছবি ফুটে উঠেছে বিশ্বসাহিত্যে তেমনটা সত্যিই দুর্লভ। কখনো জীবনের প্রতি সুগভীর মমতায় মৃত্যুকে, নানা দুঃখ-বেদনাকে সহনীয় করে তুলতে পেরেছেন : 'ব্যক্তিগত শোকদুঃখ নিচে দিয়ে চলে যায় এবং তার উপরে কঠিন পাথরের ব্রিজ বেঁধে লক্ষ লোকপূর্ণ কর্মের রেলগাড়ি আপন লৌহ-পথে হু হু শব্দে চলে যায়—নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া কারও খাতিরে কোথাও থামে না।' আবার অন্যত্র এক বিশাল প্রকৃতিজগৎ ও বিস্তীর্ণ মানবমেলার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবার গূঢ় বাসনায় লিখলেন : 'আমি যখন মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে যাব, তখনও আমার অনন্ত প্রাণময় বিশ্বাত্মার সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন হবে না—আমি আমার নিজের ভিতরকার সহজ আনন্দ থেকে এইটে অনুভব করি।' ভানুসিংহের পত্রাবলী-র একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'চিঠি জিনিসটা ছোট, মালতী ফুলের মতো, কিন্তু সেই চিঠি যে আকাশের মধ্যে ফুটে ওঠে সেই আকাশ মানবচিত্তের মতোই বড়।' চিঠিপত্র কিভাবে সাহিত্যের পদবি পেয়ে যায়, কিভাবে ছোট্ট মালতীফুল ফুটে ওঠে বিস্তৃত মনোজগতের পরিধি জুড়ে, রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র তার অতুলনীয় উদাহরণ।

সাধারণভাবে পত্র নির্দিষ্ট লিখনমুখী ও প্রয়োজনসর্বস্ব। এইসব পত্রের লেখক বিশেষ কথা কিছু জানাতে চান একজন বিশেষ প্রাপককে। ভাষা-ভঙ্গির সুষ্ঠুতা সত্ত্বেও এ-জাতীয় পত্রের সাহিত্যমূল্য বা গুণ থাকে না। কিন্তু পত্রে যখন তাৎক্ষণিক বৈষয়িক প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে লেখকের আন্তরিক আবেগ-অনুভব, মূল্যবান অভিজ্ঞতা বা গভীর চিন্তনমননকে পরিবেশিত হয় কোনো ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশে নয়, সকল অনুরাগী পাঠকের উপভোগ ও উপলব্ধির লক্ষ্যে, তখন পত্র হয়ে ওঠে পত্র-সাহিত্য।

পত্রাঙ্গিকে উপন্যাস লেখা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকে স্যামুয়েল রিচার্ডসনের পামেলা থেকে একালের সন্তোষ কুমার ঘোষের শেষ নমস্কার/শ্রীচরণেষু মা-কে কিংবা বুদ্ধদেব গুহর সবিনয় নিবেদন পর্যন্ত। দীর্ঘ কাব্য-কবিতায় পত্রের রীতি ব্যবহার করেছিলেন মধুসূদন দত্ত তাঁর বীরাঙ্গনা কাব্যে। তবে পত্রসাহিত্য বলতে আমরা কেবলমাত্র চিঠিপত্রের প্রতিই দৃষ্টি

সাহিত্যকে বুঝবো না। বিষয়ের বৈচিত্র্যে, উপভোগ্য, সৃজনশীল ভাষা-শৈলীতে, পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধির গভীরতায় পত্র কখন ও কিভাবে সর্বজনবেদ্য হয়ে ওঠে তার দিকে দৃষ্টি দেবো। রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র, রাশিয়ার চিঠি, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, জাপান যাত্রী ইত্যাদি পত্রসাহিত্যের রসোত্তীর্ণ উদাহরণ। এসব ক্ষেত্রে পত্র কখনো কোনো ব্যক্তির উদ্দেশে রচিত যেমন ছিন্নপত্র ; আবার কখনো তা কোনো এক অজ্ঞানা অনির্দেশ্য পাঠকের জন্য নিবেদিত। কিন্তু সর্বত্রই পত্রগুলি নিছক প্রয়োজনীয় অবগতির সীমা ছাড়িয়ে চিন্তন-মনন-অনুভবের নন্দিত বাণীরূপ। একটি নমুনা উদ্ধার করা যেতে পারে : "মানুষ কি লোহার কল, যে, ঠিক নিয়ম-অনুসারে চলবে? মানুষের মনের এত বিচিত্র এবং বিস্তৃত কাণ্ড-কারখানা—তার এত দিকে গতি—এবং এত রকমের অধিকার যে, এদিকে-ওদিকে হেলতেই হবে। এই দ্বিধা, এই দুর্বলতা যার নেই তার মন নিতান্ত সংকীর্ণ এবং কঠিন এবং জীবনবিহীন ; যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলি এবং যার প্রতি সর্বদাই কটুভাষা প্রয়োগ করি সেই আমাদের জীবনের গতিশক্তি—সেই আমাদের নানা সুখদুঃখ পাপপুণ্যের মধ্যে দিয়ে অনন্তের দিকে বিকশিত করে তুলছে।" [ইন্দিরা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র, লণ্ডন, ভ্রমণ সাহিত্য : ১০ অক্টোবর ১৮৯০]

৩. ভ্রমণসাহিত্য ● বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য :

বিবিধ গদ্যসাহিত্যের বর্তমান পরিচ্ছেদটি শেষ করব ভ্রমণসাহিত্য বিষয়ে কিছু আলোচনা করে। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের অনুসন্ধিৎসা তাকে তার পরিচিত ভৌগোলিক-সামাজিক জীবনবৃত্তের বাইরে বার বার ঠেলে দিয়েছে। কেউ পাহাড়ে, কেউ জঙ্গলে, কেউ বা সাগরে বা মরুভূমিতে পাড়ি দিয়েছেন, এবং একালে পরিবহন ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি হওয়ায় আরো বেশি বেশি করে দিচ্ছেন। এইসব ভ্রমণ ও পর্যটন, নানা দুঃসাহসিক অভিযান ইত্যাদি থেকে জন্ম নিয়েছে বা নিচ্ছে 'ভ্রমণ সাহিত্যে'র নানা স্বাদের লেখা। ভ্রমণবৃত্তান্ত হিসেবে যত কিছু লেখা হয়েছে ও হচ্ছে সবই হয়তো সাহিত্য পদবাচ্য হবে না। কেবল কোন অজানা-অচেনা স্থানের বর্ণনা ও মানুষজনের টুকরো ছবি এবং সর্বোপরি সাল-তারিখের দড়াদড়ি থাকলেই তো আর 'ভ্রমণসাহিত্য' হয় না। সাহিত্য যখন তখন তাতে চোখের ও কানের যত পশরাই থাক না কেন, মনের খোরাক তো চাই-ই। নানা দেশ ও নানা মানুষের সঙ্গে ভ্রমণপিপাসু লেখকের যে ক্ষণকালের পরিচয় ঘটে সেই পরিচয়ের সূত্র ধরে বস্তুজগৎ যেভাবে জারিত হয় তার মানসরসে তাই সার্থক ভ্রমণকাহিনির কবচকুণ্ডল। দ্বিতীয় শতকে রচিত গ্রিক লেখক Pausanias-এর *Description of Hellas* এ-জাতীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। মার্কো পোলো তাঁর চীন ও ভারতভ্রমণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে। ষোড়শ শতকের শেষে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ অভিযানের বহু বিবরণ পাওয়া যায় যার অন্যতম Richard Hakluyt-এর *Principall Navigations, Voiages, and Discoveries of the English Nation* (1589)। অষ্টাদশ শতকে উত্তর ইওরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যুবক ভ্রমণপ্রার্থীরা যেতেন ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ড হয়ে রোম ও নেপলসে। স্মোলেট, স্টার্ন ও গোটে এ-ধরনের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছিলেন। জনসন ও বসওয়েল লিখেছিলেন তাঁদের স্কটল্যান্ড ভ্রমণের কাহিনি। ডেফোর *A Tour Through the Whole Island of Great Britain* এবং স্যামুয়েল কবেট-এর *Rural Rides* পাশ্চাত্য ভ্রমণসাহিত্যের ধারাটিকে পুষ্ট করেছিল।

প্রাচীনকাল থেকে দেশভ্রমণের নেশা এবং একালের আধুনিক পৃথিবীতে গড়ে ওঠা পর্যটন-শিল্প ভ্রমণবিষয়ক বিচিত্র ও বিপুল রচনাসম্ভারের উদ্ভব ও বিকাশের মূল ক্ষেত্র। পর্যটকদের জ্ঞাতার্থে ও তাদের ভ্রমণে উৎসাহিত করতে বেরিয়েছে নানা ধরনের গাইডবুক, প্রকাশিত হচ্ছে নানা ভাষায় অসংখ্য পত্রপত্রিকা। তবে সেসব বই ও রচনা মূলত তথ্যসমৃদ্ধ ও বিবরণমূলক। সাহিত্যের রস সেখানে লেখকদের প্রধান লক্ষ্য নয়। ক্ষেত্রবিশেষে ভ্রমণকারীর অভিজ্ঞতার গল্প সুখপাঠ্য হয়ে উঠলে তাকে বলা যায় ভ্রমণকাহিনি। আর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, তথ্য, দৈনিক বিবরণ ইত্যাদি যখন আবেগ-অনুভূতির স্পর্শে, ভাষার ঐশ্বর্যে, দার্শনিক জিজ্ঞাসার কাড়িগত স্তর থেকে উত্তীর্ণ হয় সব মানুষের আস্বাদন ও উপলব্ধির স্তরে তখন তাকে বলা যায় ভ্রমণ-সাহিত্য। একথা অনস্বীকার্য যে, ভ্রমণবৃত্তান্ত, ভ্রমণকাহিনি, ভ্রমণসাহিত্য ইত্যাদি একটিকে অন্যটি থেকে নিশ্চিতভাবে পৃথক করে ফেলা অনেকক্ষেত্রেই অত্যন্ত কঠিন। ভ্রমণবৃত্তান্ত-কে যিনি সাহিত্যমূল্যে মূল্যায়ন করতে চান তাঁকে এক নিরপেক্ষ ও সহৃদয় মানসিকতা নিয়ে স্থান, কাল, পাত্র-পাত্রীদের দেখতে হবে। কোন বিশেষ অঞ্চলের প্রকৃতি, সমাজ ও মানুষের জীবনযাত্রার টুকরো টুকরো ছবির মধ্যেই নিরাসক্তভাবে লেখক দেখবেন ও দেখাবেন সত্য ও সুন্দরকে। বাংলায় এ ধরনের ভ্রমণকাহিনির বিশেষ উপভোগ্য উদাহরণ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পালামৌ এবং অক্ষয়চন্দ্র গুপ্তের নদীপথে। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ভ্রমণ-কাহিনিকার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে ধারাবাহিকভাবে দেখলে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ অনেকেই এই শাখাটিকে উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি, নবীনচন্দ্র সেনের প্রবাসের পত্র, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোষ্ঠীর ফলাফল, চীন যাত্রী, জলধর সেনের হিমালয় প্রভৃতি বাংলায় লেখা ভ্রমণবৃত্তান্ত বা কাহিনির জনপ্রিয় কয়েকটি উদাহরণ। ভ্রমণসাহিত্যে বিশেষ কীর্তি রেখে গেছেন মহাপ্রস্থানের পথে ও দেবতাত্মা হিমালয়-এর লেখক প্রবোধকুমার সান্যাল, পথে-প্রবাসে-র লেখক অন্নদাশঙ্কর রায়, দুয়ার হতে অদূরে, অবাক্রান্ত জয়যাত্রা প্রভৃতির কাহিনিকার বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শঙ্কু মহারাজ ও আরো অনেকে। এঁদের মধ্যে যাঁরা পাঠকদের বিশেষ প্রিয় তাঁদের রচনায় ভ্রমণের যান্ত্রিক বিবরণ অথবা প্রবন্ধধর্মী বিশ্লেষণ নেই, যা আছে তা হলো কথাশিল্পের জীবনবোধ, কাহিনিবিন্যাসের দক্ষতা। ভ্রমণসাহিত্যের সঙ্গে উপন্যাসশিল্পের যোগ অস্বীকার করার উপায় নেই।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে সার্থক রূপকার হিসেবে অনেকেই স্মরণীয়। এঁদের মধ্যে বহু খণ্ডে বিভক্ত সুবৃহৎ গ্রন্থ রম্যাণি বীক্ষ্য-এর লেখক সুবোধকুমার চক্রবর্তী ও হিমালয়-ভ্রমণের অনবদ্য রূপকার উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের দর্শনীয় স্থান সমূহের নানা মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য তথা ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার বিবরণ তুলে ধরেছেন রম্যাণি বীক্ষ্যের লেখক, পাণ্ডিত্যের ঐশ্বর্য ও উপন্যাসের ভঙ্গিতে। পাণ্ডিত্যের লোভ সংবরণ করে সুন্দর কবিত্বপূর্ণ ভাষায় হিমালয়-ভ্রমণের অসামান্য অভিজ্ঞতাসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গঙ্গাবতরণ, পঞ্চকেদার প্রভৃতি গ্রন্থে। এক নির্লিপ্ত বৈরাগীর মতো কেদার, বদরি, মুক্তিনাথ মণিমহেশ, তপোবন-সহ গাড়োয়াল হিমালয়ের আনাচে-কানাচে গিয়েছেন উমাপ্রসাদ। তাঁর ভ্রমণ-উপাখ্যান এক চিরপথিকের স্বচ্ছ, সাবলীল, রসসিক্ত কাহিনি। বর্ণনার মায়াবী রহস্যে হিমালয়ের পরিচিত দৃশ্যও যেন রূপকথার মতো মনে হয়—'মন্দাকিনী যেদিক থেকে নেমে আসেন সেই দিকে সন্ধ্যার আকাশে মেঘের

ফাঁকে দিগন্ত জোড়া কেদারনাথের চূড়া। যেন মেঘলোকে 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা।' দূরে পাহাড়ের গায়ে পাইনের সারি। পূর্ণিমা রাত। ছোট চটিতে শুয়ে বরফের দৃশ্য দেখি। চোখে ঘুমের আবেশ জাগে, তন্দ্রার মধ্যেও সে রূপ দেখি। হঠাৎ জেগে বসি। দেখি, অতন্দ্র প্রহরী তেমনি জ্যোৎস্নাস্নাত হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে।"

ভ্রমণ/পর্যটন-বিষয়ক যে-কোনো স্বাদের রচনাই সাধারণভাবে 'ভ্রমণসাহিত্য' শ্রেণীভুক্ত হলেও এর মধ্যে মেজাজ, রীতি, উপভোগ্যতার রকমফের বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভ্রমণার্থীদের সাহায্যার্থে পত্র-পত্রিকায় যে-সব নিবন্ধ প্রকাশিত হয় সেগুলিতে যাতায়াতের সুবিধা-অসুবিধা, দর্শনীয় স্থানসমূহ, থাকবার ও আহারাদির ব্যবস্থা, খরচ-খরচার হিসেব ইত্যাদি বেশি গুরুত্ব পায়। গাইডবুকগুলিও এ-ধরনের তথ্যে পূর্ণ থাকে। এসব রচনায় উপযোগিতার দিকটি প্রাধান্য পায় বলে সাহিত্যমূল্য বিশেষ থাকে না। যখন সাধারণ ছুটি কাটানো পর্যটকের বদলে লেখক পরিব্রাজকের মতো পথে নামেন, উদাসী বাউলের জীবনতৃষ্ণা নিয়ে ঘুরে বেড়ান মনের জানালাগুলি খুলে দিয়ে, ভ্রমণের বিবরণ ও অভিজ্ঞতা তখন তথ্যনিষ্ঠার যান্ত্রিকতা অতিক্রম করে মানুষের সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব ইত্যাদির চলচ্ছবি হয়ে ওঠে। অবশ্যই ভ্রমণের বৃত্তান্তকে এমন রমণীয় ও গভীর মাত্রা পেতে হলে ভাষা ও শৈলীর উৎকর্ষ থাকাটা অপরিহার্য। যাযাবরের *ঝিলম নদীর তীরে* কিংবা উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হিমালয় ভ্রমণের কাহিনিতে সেই উৎকর্ষ আমাদের মুগ্ধ করে। প্রাচীন গ্রিক লেখক Pausanias-এর গাইডবুকের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতের ইতিহাসে মেগাস্থিনিস, ফা হিয়েন, হিউয়েন সাঙ প্রমুখ পর্যটকদের বৃত্তান্তের কথা পড়েছি। সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ভৌগোলিক-দার্শনিক নানা তথ্য ও বার্তা সেসব বিবরণে আছে। মধ্যযুগে ও রেঁনেসাসের সময়কার ইওরোপে বহু ম্যানুয়াল/গাইডধর্মী ভ্রমণগ্রন্থ রচিত হয়েছিলো। তাদের মধ্যে কোন্‌গুলি কতখানি সাহিত্য পদবাচ্য হবে তা বলা মুশকিল।

ভ্রমণসাহিত্য ঐসব গাইডধর্মী ভ্রমণকাহিনি থেকে অনেকখানি আলাদা এক সুসমৃদ্ধ শাখা যার গোত্রটি চিনে নিতে নিম্নলিখিত সূত্রগুলি সাহায্য করবে :

১. লেখকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি, উপলব্ধি, আবেগ-মনন হবে রচনার মূল ভিত্তি।
২. মানবজীবন, লোকাচার, লোকসংস্কৃতি ইত্যাদির সামগ্রিক ও বিশ্বাসযোগ্য চিত্র ভ্রমণবৃত্তান্তের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে থাকবে।
৩. বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশে থাকবে গল্পকাহিনির রমণীয় আস্বাদ্যতা, ফুটে উঠবে জীবনবোধ, গভীর ও চিরন্তন রহস্যময়তা।
৪. সাধারণত উত্তম পুরুষ বিবরণদাতার বয়ানে লেখা হলেও কোথাও ডায়েরি বা দিনলিপি, কোথাও রোমান্স বা রম্যরচনার আঙ্গিক ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
৫. শিল্পিত, সৃজনশীল, কাব্যময় ভাষা ভ্রমণ সাহিত্যের এক অপরিহার্য শর্ত।

প্রকৃতিশোভার নিবিড় বর্ণনার সঙ্গে দার্শনিক ভাবুকতার মিশ্রণে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণকাহিনিগুলির যে-ধরনের আকর্ষণ পাঠক বোধ করেন, উমাপ্রসাদ বা জলধর সেন বা প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ের সহজ সরল, রসস্নিগ্ধ রচনা তা থেকে কিছুটা ভিন্ন। আবার যদি আমরা মুজতবা আলির *দেশে বিদেশে* পড়ি তখন অন্য এক সরস, বুদ্ধিদীপ্ত ভঙ্গি আমাদের মোহিত করে। এরপর সুবোধ চক্রবর্তীর বহু খণ্ডে পর্বায়িত *রম্যাণি বীক্ষ্য* হাতে তুলে নিলে ভ্রমণকাহিনি উপন্যাসের আমেজে 'ভ্রমণ-উপন্যাস' হয়ে ওঠে।

Scanned with CamScanner